স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

যোগ ও মনোবিজ্ঞান

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. যোগ ও মনোবিজ্ঞান 2
২. মনের শক্তি 7
৩. আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি 24
৪. রাজযোগের লক্ষ্য 29
৫. একাগ্রতা 31
৬. একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়া 40
৭. প্রাণায়াম 45
৮. ধ্যান 51
৯. সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 64
১০. রাজযোগ-প্রসঙ্গে 80
১১. রাজযোগ-শিক্ষা 82

১. যোগ ও মনোবিজ্ঞান

পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানের ধারণা অতি নিম্নস্তরের। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান; কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে—অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ইহাকেও উপযোগিতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। কার্যতঃ মানবসমাজের উপকার ইহার সাহায্যে কতটা সাধিত হইবে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সুখ ইহার মাধ্যমে কতদূর বর্ধিত হইবে? যে-সকল দুঃখ-বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছি, সেগুলি ইহা দ্বারা কতদূর প্রশমিত হইবে? পাশ্চাত্যে সব-কিছুই এই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

মানুষ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যায় যে, আমাদের জ্ঞানের শতকরা নব্বই ভাগ স্বভাবতই মানুষের পার্থিব সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধির উপর কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই দৈনন্দিন জীবনে কার্যতঃ প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের চেতনমনের অতি সামান্য অংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে এবং ঐ সামান্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই জীবন ও মনের সব-কিছু বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে উহা একটি সামান্য বিন্দুমাত্র। যদি আমাদের অস্তিত্ব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে-সব জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। পশুস্তর হইতে যতই আমরা উপরে উঠিতে থাকি, আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ-বাসনা ততই হ্রাস পাইতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বোধের সহিত আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের অনুশীলন'—এই ভাবটি ইন্দ্রিয়সুখ-নিরপেক্ষ হইয়া মনের পরম আনন্দের বিষয় হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্যে প্রচলিত পার্থিব লাভের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সেরা। কেন? আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়ের দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস। কোন অপরাধী যে স্বেচ্ছায় কোন অপরাধ করে—তাহা

নয়, শুধু নিজের মন তাহার আয়ত্তে না থাকাতেই সে ঐরূপ করিয়া থাকে, এবং এইজন্য সে তাহার চেতন ও অবচেতন মনের, এমন কি প্রত্যেকের মনেরও দাস হয়। সে নিজ মনের প্রবলতম সংস্কারবশেই চালিত হয়। সে নিরুপায়। সে নিজ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে–বিবেকের কল্যাণকর নির্দেশ এবং নিজের সৎস্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। সে তাহার মনের প্রবল নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। বেচারী মানুষ নিতান্তই অসহায়।

প্রতিনিয়ত ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অন্তরের শুভনির্দেশ আমরা প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করিতেছি এবং পরে ঐজন্য নিজেরাই নিজেদের ধিক্কার দিতেছি। আমরা বিস্মিত হই–কিভাবে ঐরূপ জঘন্য চিন্তা করিয়াছিলাম, এবং কিভাবেই বা ঐ প্রকার হীনকার্য আমাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। অথচ আমরা পুনঃপুনঃ ইহা করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ ইহার জন্য দুঃখ ও আত্মগ্লানি ভোগ করি। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের মনে হয় যে, ঐ কর্ম করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহা নয়, আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ইহা করিয়াছিলাম। আসলে আমরা নিরুপায়! আমরা সকলেই নিজেদের মনের ক্রীতদাস এবং অপরের মনেরও। ভালমন্দের তারতম্য এক্ষেত্রে প্রায় অর্থহীন। অসহায়ের ন্যায় আমরা ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি। আমরা মুখেই বলি, আমরা নিজেরা করিতেছি, ইত্যাদি; কিন্তু আসলে তাহা নয়।

চিন্তা করিতে এবং কাজ করিতে বাধ্য হই বলিয়া আমরা চিন্তা এবং কাজ করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের এবং অপরের দাস। আমাদের অবচেতন মনের অতি গভীরে অতীতের চিন্তা ও কর্মের যাবতীয় সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে–শুধু এ-জীবনের নয়, পূর্ব পূর্ব জীবনেরও। এই অবচেতন মনের অসীম সমুদ্র অতীতের চিন্তা ও কর্মরাশিতে পরিপূর্ণ। এই-সকল চিন্তা ও কর্মের প্রত্যেকটি স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করিতেছে, নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, একটি অপরটিকে অতিক্রম করিয়া চেতন-মানসে রূপ পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেছে–তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে তাহাদের প্রবাহ। এই-সকল চিন্তা ও পুঞ্জীভূত শক্তিকেই আমরা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করি, কারণ উহাদের যথার্থ উৎপত্তিস্থল আমরা জানি না।

অন্ধের মত বিনা প্রতিবাদে উহাদের নির্দেশ আমরা পালন করি। ফলে দাসত্ব—চরম অসহায় দাসত্ব আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, অথচ নিজেদের 'মুক্ত' বলিয়া আমরা প্রচার করি। হায়, আমরা নিজেদের মনকে নিমেষের জন্য সংযত করিতে পারি না, বস্তু-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মুহূর্তের জন্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখ। যেভাবে করা উচিত বলিয়া আমরা জানি, অতি অল্প সময়ের জন্যও আমরা সেভাবে করিতে পারি না। মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয়-বাসনা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে তৎক্ষণাৎ আমরা উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ি। এরূপ দুর্বলতার জন্য আমরা বিবেক-দংশন ভোগ করি, কিন্তু পুনঃপুনঃ আমরা এইরূপই করিয়া থাকি এবং সর্বদাই ইহা করিতেছি। যত চেষ্টাই করি না কেন, একটি উচ্চমানের জীবন আমরা যাপন করিতে পারি না। অতীত জীবন এবং অতীত চিন্তাগুলির ভূত যেন আমাদিগকে দাবাইয়া রাখে। ইন্দ্রিয়গুলির এই দাসত্ব জগতের সকল দুঃখের মূল। জড়দেহের উর্ধ্বে উঠিবার অসামর্থ্য—পার্থিব সুখের জন্য চেষ্টা আমাদের সকল দুর্দশা ও ভয়াবহতার হেতু।

মনের এই উচ্ছৃঙ্খল নিম্নগতিকে কিভাবে দমন করা যায়, কিরূপে উহাকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনা যায়, এবং উহার দোর্দণ্ড প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, মনোবিজ্ঞান তাহারই শিক্ষা দেয়। অতএব মনোবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান; উহাকে বাদ দিলে অন্যান্য বিজ্ঞান ও জ্ঞান মূল্যহীন।

অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদিগকে নিয়ত নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে লইয়া যাইবে এবং চরমে আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, ধ্বংস করিবে। আর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে। সুতরাং মনকে অবশ্য সংযত করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আমাদিগকে মনঃসংযমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

যে-কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রচুর তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। ঐ-সকল তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার ফলে ঐ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মনের অনুশীলন ও বিশ্লেষণে সকলের সমভাবে আয়ত্ত কোন তথ্য

ও বাহির হইতে সংগৃহীত উপাদান পাওয়া যায় না—মন নিজের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলিয়া ধরা যায়। পাশ্চাত্যে মানসিক শক্তিকে, বিশেষতঃ অসাধারণ মানসিক শক্তিকে, অনেকটা যাদুবিদ্যা ও গূঢ় যৌগিকক্রিয়ার সামিল বলিয়া গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ সেই দেশে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত মিশাইয়া ফেলিবার ফলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের অনুশীলন ব্যাহত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে সেই-সকল সাধু-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা সিদ্ধাই-জাতীয় ব্যাপারে অনুরক্ত।

পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফল লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য, এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।

মনের অতি-গভীর প্রদেশে বিরাজ করেন আত্মা, মানুষের প্রকৃত সত্তা। মনকে অন্তর্মুখী কর, আত্মার সহিত সংযুক্ত কর; এবং স্থিতাবস্থার সেই দৃষ্টিকোণ হইতে মনের আবর্তনগুলি লক্ষ্য কর, সেগুলি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ঐ-সকল তথ্য বা উপাত্ত ও ঘটনা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতিগম্য, যাঁহারা ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যেই মনের গতি, প্রকৃতি, শক্তি প্রভৃতি লইয়া প্রভূত মতভেদ দেখা যায়। ইহার কারণ, তাঁহারা মনোজগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের এবং অন্যান্যের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং ঐ- সকল একান্ত বাহ্য ও ভাসা ভাসা অভিব্যক্তির যথার্থ প্রকৃতি না জানিয়া ঐগুলিকেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া

ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মেই ছিটগ্রস্ত এমন একদল লোক থাকেন, যাঁহারা ঐ-সকল উপাদান, তথ্য প্রভৃতিকে মৌলিক গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য বিচারের মান বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের মস্তিষ্কের উদ্ভট খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি মনের রহস্য অবগত হওয়াই অভীপ্সিত হয়, তবে তোমাকে নিয়মানুগ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তুমি একটি চেতন স্তরে উঠিতে চাও, যেখান হইতে মনকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং মনের উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না, তবে মনকে সংযত করিতে অভ্যাস কর। নতুবা তোমার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি নির্ভরযোগ্য হইবে না, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং মোটেই যথার্থ উপাদান ও তথ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

যে-সকল মানুষ মনের প্রকৃতি লইয়া গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, দেশ বা মত-নির্বিশেষে তাঁহাদের উপলব্ধি চিরদিন একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের গভীরতম প্রদেশে যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহাদের উপলব্ধি কখনও ভিন্ন হয় না।

অনুভূতি ও আবেগপ্রবণতা হইতেই মানুষের মন ক্রিয়াশীল হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলোক রশ্মি আমার চক্ষুতে প্রবেশ করে, এবং স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তথাপি আমি আলো দেখিতে পাই না। তারপর মস্তিষ্ক ঐ আবেগকে মনে বহন করিয়া লইয়া যায়, তথাপি আমি আলো দেখি না; মনে যখন তাহার প্রতিক্রিয়া জন্মে, তখনই মনে আলোর অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়াই অনুপ্রেরণা এবং তাহারই ফলে চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন করে।

মনকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার অবচেতন স্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে যে-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে হইবে, সাজাইতে হইবে এবং সংযত করিতে হইবে। ইহাই প্রথম সোপান। অবচেতন-মনকে সংযত করিতে পারিলেই চেতন মনও বশীভূত হইবে।

২. মনের শক্তি

[লস এঞ্জেলেস্, ক্যালিফর্নিয়া, ৮ জানুআরী ১৯০০ খ্রীঃ]

সর্ব যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। অসাধারণ ঘটনার কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এ-বিষয়ে আমাদের অনেকের নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। বিষয়টির প্রস্তাবনারূপে আমি বরং তোমাদের নিকট প্রথমে আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনারই উল্লেখ করিব। একবার এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া-ছিলাম; মনে মনে কোন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিতেন; আরও শুনিয়াছিলাম, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। মনে কৌতূহল জাগিল; তাই কয়েকজন বন্ধুসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যেকেই মনে মনে কোন-না-কোন প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিলাম এবং পাছে ভুল হয়, সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজ নিজ জামার পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাঁহার যেমনি দেখা হইতে লাগিল, অমনি তিনি তাঁহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া উত্তর বলিয়া দিতে লাগিলেন। পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাগজটি ভাঁজ করিয়া আমার হাতে দিলেন, এবং তাহার অপর পিঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'এটি দেখিবেন না, পকেটে রাখিয়া দিন; যখন বলিব, তখন বাহির করিবেন।' আমাদের সকলের সঙ্গেই এই রকম করিলেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটিবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, 'আপনাদের যে ভাষায় খুশী, কোন শব্দ বা বাক্য চিন্তা করুন।' আমি সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে আওড়াইলাম; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন, 'পকেট হইতে কাগজটি বাহির করুন তো!' দেখি, তাহাতে সেই সংস্কৃত বাক্যটিই লেখা রহিয়াছে! এক ঘণ্টা আগে তিনি এটি লিখিয়াছিলেন, আর নীচে মন্তব্য দিয়াছিলেন, 'যাহা লিখিয়া রাখিলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই ভাবিবেন'—ঠিক তাহাই হইল। আমাদের অন্য একজন বন্ধুকেও অনুরূপ একখানি কাগজ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বাক্ষর করিয়া পকেটে

রাখিয়াছিলেন। এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিন্তা করিতে বলিলে তিনি কোরানের একাংশ হইতে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবিলেন। ঐ ব্যক্তির সে ভাষা জানিবার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখিলেন, সেই বাক্যটিই কাগজে লেখা আছে।

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ডাক্তার। তিনি জার্মান ভাষায় লিখিত কোন ডাক্তারি পুস্তক হইতে একটি বাক্য ভাবিলেন। তাঁহার কাগজে তাহাই পাওয়া গেল।

সেদিন হয়তো কোনরূপ প্রতারিত হইয়াছি ভাবিয়া কিছুদিন পরে আমি আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে নূতন আর একদল বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আর একবার–ভারতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনিলাম যে, সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি হরেক রকমের জিনিষ বাহির করিয়া দিতে পারেন। কোথা হইতে যে আসে সেগুলি, কেহই জানে না। তিনি একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমি তাঁহার কৌশল দেখিতে চাহিলাম। ঘটনাচক্রে তখন তাঁহার জ্বর। ভারতে একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন সাধু ব্যক্তি অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলে তাহার অসুখ সারিয়া যায়। ব্রাহ্মণটি সেজন্য আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, মাথায় হাত বুলাইয়া আমার জ্বর সারাইয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'ভাল কথা, তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাইতে হইবে।' তিনি রাজী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছামত আমি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম; তিনিও তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বাহিরে আসিলেন। তাঁহার কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাঁহার দেহ হইতে আর সব পোষাকই খুলিয়া লইলাম। বেশ শীত পড়িয়াছিল, সেজন্য আমার কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলাম; ঘরের এক-কোণে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল, আর পঁচিশ জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাঁহার দিকে। তিনি বলিলেন, 'যিনি যাহা চান, কাগজে তাহা লিখিয়া ফেলুন।' সে অঞ্চলে কখনও জন্মে না, এমন সব ফলের নাম আমরা লিখিলাম–আঙুর, কমলালেবু, এই-সব ফল। লেখার পর কাগজগুলি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কম্বলের ভিতর হইতে আঙুরের থোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বাহির হইল।

এত ফল জমিয়া গেল যে, ওজন করিলে সব মিলিয়া তাঁহার দেহের ওজনের দ্বিগুণ হইয়া যাইত। সে-সব ফল আমাদের খাইতে বলিলেন। আমাদের ভিতর কেহ কেহ আপত্তি জানাইলেন, ভাবিলেন ইহাতে সম্মোহনের ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজেই খাইতে শুরু করিলেন দেখিয়া আমরাও সবাই উহা খাইলাম। সেগুলি আসল ফলই ছিল।

সব শেষে তিনি একরাশি গোলাপফুল বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি ফুলই নিখুঁত– শিশিরবিন্দু পর্যন্ত রহিয়াছে পাপড়ির উপর; একটিও থেঁতলানো নয়, একটিও নষ্ট হয় নাই। আর একটি দুটি তো নয়, রাশি রাশি ফুল! কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল–জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'সবই হাত-সাফাই এর ব্যাপার।'

তা যে-ভাবেই ঘটুক, এটি বেশ বোঝা গেল যে, শুধু হাত-সাফাই এর দ্বারা এরূপ ঘটানো অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিষ তিনি আনিলেন কোথা হইতে?

যাহাই হউক, এরূপ বহু ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ভারতে ঘুরিলে বিভিন্ন স্থানে এরূপ শত শত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই এ-সব আছে। এমন কি এদেশেও এ ধরনের অদ্ভুত ঘটনা কিছু কিছু চোখে পড়ে। অবশ্য ভণ্ডামিও বেশ কিছু আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখ–ভণ্ডামি দেখিলেই এ-কথাও তো বলিতে হইবে যে, উহা কোন কিছু সত্য ঘটনার অনুকরণ। কোথাও না কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে, যাহার অনুকরণ করা হইতেছে। শূন্য- পদার্থের তো আর অনুকরণ হয় না। অনুকরণ করিতে হইলে অনুকরণ করিবার মত যথার্থ সত্য বস্তু একটি থাকা চাই- ই।

অতি প্রাচীন কালে, হাজার হাজার বছর আগে, ভারতে আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই এই-সব ঘটনা ঘটিত। আমার মনে হয়, যখন কোন দেশে লোকবসতি খুব বেশী ঘন হয়, তখন যেন মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পায়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে যদি লোকবসতি খুব পাতলা হয়, তাহা হইলে সেখানে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ ঘটে।

হিন্দুদের ধাত খুব বিচারপ্রবণ বলিয়া এই-সব ঘটনার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ইহা লইয়া তাঁহারা গবেষণা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তেও পৌঁছিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহা লইয়া তাঁহারা একটি বিজ্ঞানই গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এ-সব ঘটনা অসাধারণ হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়; অতি-প্রাকৃতিক বলিয়া কিছুই নাই। জড়জগতের অন্য যে-কোন ঘটনার মতই এগুলিও নিয়মাধীন। কেহ এইরূপ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নাই; কেন-না এই সিদ্ধান্তগুলি লইয়া যথারীতি গবেষণা ও সাধন করা যায়, এবং এগুলি অর্জন করা যায়। তাঁহারা এই বিদ্যার নাম দিয়াছিলেন ‘রাজযোগ’। ভারতে হাজার হাজার লোক এই বিদ্যার চর্চা করে; ইহা সে-জাতির নিত্য-উপাসনার একটি অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই এই-সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট মনেরই অংশমাত্র। প্রত্যেক মনের সঙ্গেই অপরাপর সব মনের সংযোগ রহিয়াছে। একটি মন যেখানেই থাকুক না কেন, গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাহার সত্যিকারের যোগাযোগ রহিয়াছে।

দূরদেশে চিন্তা প্রেরণ করা-রূপ যে একজাতীয় ঘটনা আছে, তাহা কখনও লক্ষ্য করিয়াছ কি? এখানে কেহ কিছু চিন্তা করিল; হয়তো ঐ চিন্তাটি অন্য কোথাও অন্য কাহারও মনে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। হঠাৎ যে এমন হয়, তাহা নয়। উপযুক্ত প্রস্তুতির পরে—কেহ হয়তো দূরবর্তী কাহারও মনে কোন চিন্তা পাঠাইবার ইচ্ছা করে; আর যাহার কাছে পাঠানো হয়, সেও টের পায় যে, চিন্তাটি আসিতেছে; এবং যেভাবে পাঠানো হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উহা গ্রহণ করে—দূরত্বে কিছু যায় আসে না। চিন্তাটি লোকটির কাছে ঠিক পৌঁছায়, এবং সে সেটি বুঝিতে পারে। তোমার মন যদি একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে এখানে থাকে, আর আমার মন অন্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে ওখানে থাকে এবং এ দুই-এর মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে আমার মনের চিন্তা তোমার কাছে পৌঁছায় কিরূপে? সাধারণ ক্ষেত্রে আমার চিন্তাগুলি যে তোমার কাছে সোজাসুজি পৌঁছায়, তা নয়; আমার

চিন্তাগুলিকে 'ইথার'-এর তরঙ্গে পরিণত করিতে হয়, সেই ইথার-তরঙ্গগুলি তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছিলে সেগুলিকে আবার তোমার নিজের মনের চিন্তায় রূপায়িত করিতে হয়। চিন্তাকে এখন রূপান্তরিত করা হইতেছে, আর সেখানে আবার উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। প্রক্রিয়াটি এক পরোক্ষ জটিল পথে চলে। কিন্তু টেলিপ্যাথিতে (ইচ্ছাসহায়ে দূরদেশে চিন্তা প্রেরণের ব্যাপারে) তাহা করিতে হয় না; এটি প্রত্যক্ষ সোজাসুজি ব্যাপার।

ইহা হইতেই বোঝা যায়, যোগীরা যেরূপ বলিয়া থাকেন মনটি সেরূপ নিরবচ্ছিন্নই বটে। মন বিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট এই-সব মনই সেই এক বিরাট মনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, একই মানস-সমুদ্রের কয়েকটি ছোট ছোট তরঙ্গ; আর মনের এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই আমরা একজন আর একজনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা পাঠাইতে পারি।

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে—দেখ না। জগৎ জুড়িয়া যেন একটা প্রভাব-প্রসারের ব্যাপার চলিতেছে। নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাকী শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যয়িত হইতেছে অপরকে প্রভাবান্বিত করার কাজে। আমাদের শরীর, আমাদের গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক এইভাবেই আমরাও অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছি। আমাদের চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি স্থূল উদাহরণ দিতেছি। কেহ হয়তো আসিলেন, যাঁহাকে তুমি সুপণ্ডিত বলিয়া জান এবং যাঁহার ভাষা মনোরম; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি তোমার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিলেন না। আর একজন আসিয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও সুসংবদ্ধ ভাষায় নয়, হয়তো বা ব্যাকরণের ভুলও রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তোমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছ। কাজেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ কাটিতে পারে না; লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা—এমন কি চিন্তা

পর্যন্ত কাজ করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকী দুইভাগ কাজ করে ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই বাহিরে গিয়া তোমাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন; দেখা যায়—তাঁহাদের ভিতর কয়েকজন এ-কাজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? আমাদের সফলতার জন্য আমরা দোষ চাপাই পরিবারের অন্য লোকদের উপর। অকৃতকার্য হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এইরূপ হইল। বিফলতার সময় নিজের দোষ বা দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দোষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর কিছুর ঘাড়ে, না হয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্য হন, তখন তাঁহাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোলা উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা পারে না কেন? দেখা যাইবে যে, সব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর; পার্থক্য সৃষ্টির কারণ হয় লোকটি নিজে, তাহার উপস্থিতি বা তাহার ব্যক্তিত্ব।

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথা ভাবিতে গেলে আমরা সর্বদা দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। অতীতের বড় বড় সব গ্রন্থকারদের, বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি চিন্তাই বা তাঁহারা করিয়াছেন? মানবজাতির পুরাতন নেতারা যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সবটার কথাই ভাব; তাঁহাদের প্রত্যেকখানি পুস্তক লইয়া উহার মূল্য নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যে-সব যথার্থ চিন্তার, নূতন ও খাঁটি চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ মুষ্টিমেয়। আমাদের জন্য যে-সব চিন্তা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ। গ্রন্থকারেরা যে মহামানব ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না, অথচ জীবৎকালে তাঁহারা যে মহামানবই ছিলেন, তাহা সুবিদিত। তাঁহারা এত বড় হইয়াছিলেন কিভাবে? শুধু তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য তাঁহারা বড় হন নাই; এ-সব ছাড়া আরও কিছু ছিল, যাহা এখন আর নাই; সেটি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব। আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনভাগের দুইভাগ, আর তাঁহার বুদ্ধির, তাঁহার ভাষার প্রভাব তিনভাগের একভাগ। প্রত্যেকের ভিতরই

আমাদের আসল মানুষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি প্রকৃত কাজ করে; আমাদের ক্রিয়াগুলি তো শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ। মানুষটি থাকিলে কাজ হইবেই; কার্য কারণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য।

সর্ববিধ জ্ঞানদানের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত ভিতরের মানুষটিকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু তাহার বদলে আমরা সব সময় বাহিরটি মাজিয়া ঘষিয়া চাকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত। ভিতর বলিয়া যদি কিছু নাই রহিল, তবে শুধু বাহিরের চাকচিক্য বাড়াইয়া লাভ কি? মানুষকে উন্নত করাই সর্ববিধ শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে-ব্যক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি সমজাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাদুমন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি যেন শক্তির একটা আধার-বিশেষ। ঐরূপ মানুষ তৈরী হইয়া গেলে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ ব্যক্তিত্ব যে-বিষয়ে নিয়োজিত হইবে, তাহাই সফল করিয়া তুলিবে।

এখন কথা হইতেছে, ইহা সত্য হইলেও আমাদের পরিচিত কোন প্রাকৃতিক নিয়ম সহায়ে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। রসায়নের বা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানসহায়ে ইহা বুঝানো যাইবে কিরূপে? কতখানি ‘অক্সিজেন,’ কতখানি ‘হাইড্রোজেন,’ কতখানি ‘কার্বন’ ইহাতে আছে, কতগুলি অণু কিভাবে সাজানো আছে, কতগুলি কোষ লইয়াই বা ইহা গঠিত হইয়াছে—ইত্যাদির খোঁজ করিয়া এই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের কি বুঝিব আমরা? তবু দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য; শুধু তাহাই নয়, এই ব্যক্তিত্বটিই আসল মানুষ; এই মানুষটিই বাঁচিয়া থাকে, চলাফেরা করে, কাজ করে; এই মানুষটিই সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের পরিচালিত করে, আর শেষে চলিয়া যায়; তাহার বুদ্ধি, তাহার গ্রন্থ, তাহার কাজ—এগুলি তাহার পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া নিদর্শন মাত্র। বিষয়টি ভাবিয়া দেখ। বড় বড় ধর্মাচার্যদের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলনা করিয়া দেখ। দার্শনিকেরা ক্বচিৎ কখনও কাহারও ভিতরের মানুষটিকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছেন, অথচ লিখিয়া গিয়াছেন অতি অপূর্ব সব গ্রন্থ। অপরদিকে ধর্মাচার্যেরা জীবৎকালেই বহুদেশের লোকের মনে সাড়া জাগাইয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিত্বই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিকদের ক্ষেত্রে

প্রভাব বিস্তার করিবার মত ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ। বড় বড় ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিদের বেলা উহা অতি প্রবল। দার্শনিকদের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আর ধর্মাচার্যদের ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করে জীবনকে। একটি হইতেছে যেন শুধু রাসায়নিক পদ্ধতি—কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইয়া একটি আলোর ঝলক সৃষ্টি করিতে পারে, নাও করিতে পারে। অপরটি যেন একটি আলোকবর্তিকা—ক্ষিপ্রবেগে চারিদিকে ঘুরিয়া অপর জীবন-দীপগুলি অচিরে প্রজ্বলিত করে।

যোগ-বিজ্ঞান দাবী করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবর্ধিত করিবার প্রক্রিয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে; সে-সব রীতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মানিয়া চলিলে প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম, এবং সর্ববিধ শিক্ষার রহস্যও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনী দরিদ্র ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া তোলার মূল্য অনেক। প্রাকৃতিক যে-সব নিয়ম আমাদের জানা আছে, সেগুলিরও পিছনে অতি সূক্ষ্ম সব নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ স্থূলজগতের সত্তা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্মজগতের সত্তা প্রভৃতি বলিয়া আলাদা আলাদা কোন সত্তা নাই। সত্তা বলিতে যাহা আছে, তাহা একটি-ই। বলা যায়, ইহা যেন একটি ক্রমঃসূক্ষ্ম অস্তিত্ব; ইহার স্থূলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে; (একবিন্দু অভিমুখে) এটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে; আমরা যাহাকে 'আত্মা' বলি, তাহাই সূক্ষ্মতম, আমাদের দেহ স্থূলতম। আর মনুষ্যরূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই আছে। আমাদের এই বিশ্বটিও ঠিক এইরূপই, জগৎ তাহার স্থূলতম বাহ্যপ্রকাশ, আর ক্রমশঃ একবিন্দু-অভিমুখী হইয়া চলিয়া তাহা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া আমরা জানি যে, সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রচণ্ডতম শক্তি নিহিত থাকে; স্থূলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো বিপুল ভার উত্তোলন করিতে দেখা যায়; তখন তাহার

মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাহার সারা অঙ্গে শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এ-সব দেখিয়া আমরা ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি! কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি যোগায় সুতার মত সরু স্নায়ুগুলিই; মাংসপেশীর সঙ্গে একটিমাত্রও স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাজই আর করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলি আবার শক্তি আহরণ করে আরও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি আবার শক্তি পায় চিন্তা নামক সূক্ষ্মতর বস্তুর নিকট হইতে; ক্রমে আরও সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম আসিয়া পড়ে। কাজেই সূক্ষ্মই শক্তির যথার্থ আধার। অবশ্য স্থূল স্তরের গতিগুলিই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরে যে গতি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন স্থূল বস্তু নড়ে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই গতির সঙ্গে স্থূলের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য মনে করি। কিন্তু সব শক্তিরই যথার্থ আধার সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মে কোন গতি আমরা দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিয়াই বোধ হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেষণার সহায়তায় যদি বাহ্যপ্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি ধরিতে পারি, তাহা হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ত্তে আসিবে। কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে; যখন হ্রদের উপরে উঠিয়া উহা ফাটিয়া যায়, তখনই মাত্র উহা আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটিকে দেখিতে পাই না। চিন্তার বেলাও চিন্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর বা কর্মে পরিণত হইবার পর উহা আমাদের অনুভবে আসে। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ করি যে, আমাদের চিন্তা—আমাদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। কিন্তু থাকিবে কি করিয়া? যদি সূক্ষ্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, চিন্তারূপে কর্মরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই যদি চিন্তাকে আরও সূক্ষ্মাবস্থায় তাহার মূলাবস্থায় ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে, যাহা অবলম্বনে এই-সব সূক্ষ্মশক্তি ও সূক্ষ্ম কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা, অনুসন্ধান করা, ধারণা করা এবং পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমরা নিজেকে নিজের বশে আনিতে পারিব। আর নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারে, অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আসিবে নিশ্চিত। এইজন্যই সর্বকালে পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা

ধর্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। পবিত্র ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একটি মৃৎখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় মৃত্তিকাই জানা হইয়া গিয়াছে। নিজের মন সম্বন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয়াছে, সব মনের রহস্যই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে।

এখন সূক্ষ্মাংশগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে আমরা বহু শারীরিক দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; সেইরূপ সূক্ষ্মগতিগুলি আয়ত্তে আনিতে পারিলে আমরা বহু দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি; এ-সব সূক্ষ্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতালাভ করিলে বহু বিফলতা এড়াইয়া চলা যায়। এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ইহার উপযোগিতার কথা। তারপর আরও উঁচু কথা আছে।

এখন এমন একটি মতের কথা তুলিতেছি, যাহা লইয়া সম্প্রতি কোন বিচার করিব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলিয়া যাইব। কোন জাতি যে-সব অবস্থার ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই জাতির প্রত্যেক মানুষকেই শৈশবে দ্রুতগতিতে ঐ-সব অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়; যে-সব অবস্থা পার হইয়া আসিতে একটা জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হইয়াছে, সে-সব পার হইতে শিশুটির প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক বছরের—এইটুকু যা প্রভেদ। শিশুটি প্রথমে আদিম অসভ্য মানুষেরই মত থাকে—সে পায়ের তলায় প্রজাপতি দলিয়া চলে। প্রথমাবস্থায় শিশুটি স্বজাতির পূর্বপুরুষেরই মত। যত বড় হইতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে শেষে জাতির পরিণত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। তবে সে ইহা খুব ক্ষিপ্র বেগে ও অল্প সময়ে করিয়া ফেলে। এখন সব মানুষকে একটি জাতি বলিয়া ধর, অথবা সমগ্র প্রাণিজগৎকে—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণিগণ—একটি সমগ্র সত্তা বলিয়া ভাব। এমন একটি লক্ষ্য আছে, যাহার দিকে এই জীব-সমষ্টি অগ্রসর হইতেছে। এই লক্ষ্যকে 'পূর্ণতা' বলা যাক। এমন অনেক নর-নারী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ উন্নতির পূর্বাভাস সূচিত হয়। সমগ্র মানবজাতি যতদিন না পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যুগ

যুগ ধরিয়া বারে বারে জন্ম এবং পুনর্জন্ম বরণ না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ক্ষীপ্রগতিতে সেই যুগ যুগান্তর পার হইয়া যান। আর ইহাও আমাদের জানা আছে যে, আন্তরিকতা থাকিলে প্রগতির এই প্রণালীগুলিকে খুবই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। শুধু জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়া কয়েকটি সংস্কৃতিহীন লোককে যদি কোন দ্বীপে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর সভ্যতা উদ্ভাবন করিতে থাকিবে। ইহাও আমাদের অজানা নয় যে, কিছু অতিরিক্ত সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। আমরা গাছপালার বৃদ্ধির সহায়তা করি; করি না কি? প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও গাছগুলি বাড়িয়া উঠিত, তবে দেরী হইত; বিনা সাহায্যে যতদিনে বাড়িত, তদপেক্ষা অল্প সময়ে বাড়িবার জন্য আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করি। এ-কাজ আমরা সর্বদাই করিতেছি, আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? জাতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততর কোন সীমা কি নির্দেশ করা যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, এ-কথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি? ইহাতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, আজ হইতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোটা জাতিটিই যে ধরনের মানুষে ভরিয়া যাইবে, সেইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ আজই অবতীর্ণ হইতে পারেন। যোগীরা এই কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বড় বড় অবতারপুরুষ ও আচার্যেরা এই ধরনেরই মানুষ; তাঁহারা এই এক-জীবনেই পূর্ণতা-লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালেই আমরা এরূপ মানবের দর্শন পাইয়াছি। সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা—এরূপ একজন মানব আসিয়াছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন।

উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক্; এবং যে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ। অর্থ ও অন্যান্য জাগতিক বস্তু দান করিয়া অপরকে সাহায্য করা বা দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে চলা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া—এ-সব নিতান্তই তুচ্ছ আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র।

তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বাহ্যপ্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট করিয়া দেওয়াই এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান্ উদ্দেশ্য।

জ্ঞানে, শক্তিতে, সুখ-সমৃদ্ধিতে মানুষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাতি হিসাবে আমরা ক্রমাগত উন্নত হইয়া চলিয়াছি। ইহা যে সত্য—ধ্রুব সত্য, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও কি তাহা সত্য? হাঁ, কিছুটা তো বটেই। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন জাগেঃ ইহার সীমা-নির্ধারণ হইবে কোথায়? আমার দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুট দূরে মাত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু এমন লোক আমি দেখিয়াছি—যে পাশের ঘরে কি ঘটিতেছে, চোখ বন্ধ করিয়াও তাহা দেখিতে পায়। তোমার যদি ইহা বিশ্বাস না হয়, সে-লোকটি হয়তো তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকেই শিখাইয়া দিবে কি করিয়া এভাবে দেখিতে হয়। যে-কোন লোককে ইহা শেখানো যায়। কেহ কেহ পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের মনে কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। এই-সব হাতে হাতে দেখাইয়া দেওয়া যায়।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা সীমারেখা টানিব কোথায়? এই ঘরের এককোণে বসিয়া অপরে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে পারে, পাশের ঘরের লোকটির মনের খবরই বা সে পাইবে না কেন? যে-কোন জায়গায় লোকের চিন্তাই বা টের পাইবে না কেন? না পাইবার কোন কারণ আমরা দেখাইতে পারিব না। সাহস করিয়া বলিতে পারি না, ইহা অসম্ভব। আমরা শুধু বলিতে পারি, কিভাবে ইহা সম্ভব হয়—তাহা জানি না। এরূপ ঘটা অসম্ভব—এ-কথা বলিবার কোন অধিকার জড়বিজ্ঞানীদের নাই; তাঁহারা শুধু এইটুকু বলিতে পারেন, 'আমরা জানি না।' বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল তথ্য সংগ্রহ করা, সামান্যীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া এবং সত্য প্রকাশ করা—এই পর্যন্ত। কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতে শুরু করিলে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিবে কিরূপে?

একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করিতে পারে, তাহার কোন সীমা নাই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে সে অনুরক্ত হইলে আর সব-কিছু ভুলিয়া তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়। ভারত যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা তোমরা জান। গণিতের আরম্ভ সেখানে। আজ পর্যন্ত তোমরা সংস্কৃত গণনানুযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে। আর নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানিত।

এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভারতের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল, যখন শুধু মানুষ ও মানুষের মন—এই একটি বিষয়ে ভারতের সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য-লাভের সহজতম উপায় মনে হওয়ায় এ-বিষয়টি তাঁহাদের নিকট এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করিলে মনের অসাধ্য কিছুই নাই—এই বিষয়ে ভারতীয় মনে এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস আসিয়াছিল যে, মনঃশক্তির গবেষণাই তাহার মহান্ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট সম্মোহন, যাদু ও এই জাতীয় অন্যান্য শক্তিগুলির কোনটিই অলৌকিক মনে হয় নাই। ইতঃপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, তখন তেমনি যথা নিয়মে এই বিজ্ঞানটিও শিখাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে জাতির এত বেশী দৃঢ়-প্রত্যয় আসিয়াছিল যে,

তাহার ফলে জড়বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শুধু এই একটি লক্ষ্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা বিবিধ পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলেন। কেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আলো লইয়া; বিভিন্ন বর্ণের আলোক কিভাবে শরীরে পরিবর্তন আনে, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি বিশেষ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন, একটি বিশেষ বর্ণের ভিতর বাস করিতেন, এবং বিশেষ বর্ণের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন। এইরূপে কত রকমের পরীক্ষাই না চলিতে লাগিল। অপরে কান খুলিয়া রাখিয়া ও বন্ধ করিয়া, শব্দ লইয়া পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। তাছাড়া আরও অনেকে গন্ধ এবং অন্যান্য বিষয় লইয়াও পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

সব-কিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের সূক্ষ্মভাগগুলিতে গিয়া পৌঁছানো। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সত্যই অতি অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন। বাতাসের ভিতর ভাসিয়া থাকিবার জন্য, বাতাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন। পাশ্চাত্যের একজন বড় পণ্ডিতের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, সেটি বলিতেছি। সিংহলের গভর্নর স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখিয়া উহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কতকগুলি কাঠি আড়াআড়িভাবে একটি টুলের মত সাজাইয়া ঐ টুলের উপর একটি বালিকাকে আসন করাইয়া বসানো হইল। বালিকাটি কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, যে-লোকটি খেলা দেখাইতেছিল সে একটি একটি করিয়া এই কাঠিগুলি সরাইয়া লইতে লাগিল; সব কাঠিগুলি সরাইয়া লইবার পর বালিকাটি শূন্যে ভাসিতে লাগিল। কিছু একটা গোপন কৌশল আছে ভাবিয়া গভর্নর তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া বালিকাটির নীচের শূন্য স্থানে সজোরে চালাইয়া দিলেন। দেখিলেন, কিছুই নাই সেখানে। এখন ইহাকে কি বলিবে? কোনরূপ যাদু বা অলৌকিকত্ব ইহাতে ছিল না। এইটিই আশ্চর্য ব্যাপার। এ-জাতীয় ঘটনা অলীক, এমন কথা ভারতে কেহই বলিবে না। হিন্দুদের কাছে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার পূর্বে হিন্দুদের প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, 'আরে, আমাদের কোন যোগী আসিয়া সকলকে হটাইয়া দিবে।' এটি জাতির এক চরম বিশ্বাস। বাহুবল বা তরবারির বল আর কতটুকু? শক্তি তো সবই আত্মার। ইহা সত্য হইলে ইহাতে মনের সব শক্তি নিয়োগ করিবার প্রলোভন খুবই বেশী হইবে। তবে অপরাপর বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা যেমন খুব কঠিন, এই ক্ষেত্রেও তাহাই; তাহাই বা বলি কেন, ইহা তাহার চেয়ে আরও বেশী কঠিন। তবু বেশীরভাগ লোকেরই ধারণা যে, এই-সব শক্তি অতি সহজেই অর্জন করা যায়। বিপুল সম্পদ্ গড়িয়া তুলিতে তোমার কত বছর লাগিয়াছে বল দেখি। সে-কথা ভাবিয়া দেখ একবার। প্রথমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেই তো বহু বছর গিয়াছে। তারপর তোমাকে বাকী জীবনটাই তো পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

তাহা ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু গতিহীন, স্থির। চেয়ারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি, চেয়ারটি আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মন, যাহা সদা চঞ্চল। যখনই পর্যবেক্ষণ করিতে যাও দেখিবে উহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মন এখন একটি ভাবে রহিয়াছে, পরমুহূর্তে হয়তো সেই ভাব পালটাইয়া গেল; একটার পর একটা ভাবের এই পরিবর্তন সব সময় লাগিয়াই আছে। এই-সব পরিবর্তনের মধ্যেই উহার অনুশীলন চালাইতে হইবে, উহাকে বুঝিতে হইবে, ধরিতে হইবে এবং আয়ত্তে আনিতে হইবে। কাজেই কত বেশী কঠিন এই মনোবিজ্ঞান! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন কার্যকরী প্রক্রিয়া তাহাদিগকে শিখাই না কেন? ইহা তো আর তামাশা নয়! এই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনাইতেছি; বাড়ি ফিরিয়া দেখিলে– ইহাতে ফল কিছু হয় নাই; আমিও কোন ফল দেখিতে পাইলাম না! তারপর তুমি বলিলে, 'যত সব বাজে কথা!' এই রকম যে হয়, তাহার কারণ–তুমি এইটিকে বাজে জিনিষরূপেই চাহিয়াছিলে। এই বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখিতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে, আর তারপর যেটুকু শিখিয়াছি, ছয় বছর ধরিয়া লোকের কাছে তাহা বলিয়া বেড়াইতেছি। ইহা শিখিতেই আমার ত্রিশ বছর লাগিয়াছে–কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর খাটিতে হইয়াছে। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা খাটিয়াছি, কখনও রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমাইয়াছি, কখনও-বা সারারাত্রই পরিশ্রম করিয়াছি; কখনও কখনও এমন সব জায়গায় গিয়া বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে; কখনও-বা গুহায়

বাস করিতে হইয়াছে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখ। আর এই-সব সত্ত্বেও আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না; আমি যেন এই বিজ্ঞানের বহির্বাসের প্রান্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এই বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও অত্যাশ্চর্য।

এখন তোমাদের ভিতর কেহ যদি সত্য সত্যই এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে চাও, তাহা হইলে জীবনের যে-কোন বিষয়কার্যের জন্য যতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া উহাতে লাগিয়া পড়া প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি বা তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এ বিষয়েও অগ্রসর হইতে হইবে।

বিষয়কর্মের জন্য কত মনোযোগই না দিতে হয়, আর কি কঠোর ভাবেই না উহা আমাদিগকে পরিচালিত করে! মাতা, পিতা, স্ত্রী বা সন্তান মরিয়া গেলেও বিষয়কর্ম বন্ধ থাকিতে পারে না! বুক যদি ফাটিয়াও যায়, তথাপি কর্মক্ষেত্রে আমাদের যাইতেই হইবে, প্রতিটি ঘণ্টা দারুণ যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইলেও কাজ করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষয়কর্ম; আর আমরা ভাবি ইহা যুক্তিসঙ্গত, ইহা ন্যায়সঙ্গত।

যে-কোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় এই বিজ্ঞানের জন্য। বিষয়কর্মে অনেকেই সফলতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে সফল হন খুব কম লোক। কারণ—যিনি ইহার অনুশীলন করেন, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বিষয়কর্মের বেলা যেমন সকলেই প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করেই, এই বিজ্ঞানের বেলাও ঠিক তাই; প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আভাস পায়-ই, যাহার ফলে ইহার সত্যতায় আস্থা আসে, এবং বিশ্বাস আসে যে, বহু লোক সত্য সত্যই এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত সব-কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ইহাই হইল বিজ্ঞানটির মোটামুটি কথা। নিজের শক্তিতে এবং নিজের আলোকের উপর নির্ভর করিয়া এই বিজ্ঞান অন্য যে-কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য সগর্বে আমাদিগকে আহ্বান করে। প্রবঞ্চক, যাদুকর, শঠ—এই-সবও এক্ষেত্রে আছে,

অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা থাকে, তাহা অপেক্ষা বরং বেশীই আছে। কি কারণে? কারণ তো একই—যে কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যাও তাহাতে তত বেশী। কিন্তু তাহা বলিয়া কাজটি যে ভাল হইবে না, ইহা তো আর কোন যুক্তি নয়। আর একটি কথা আছে; সমস্ত যুক্তি-বিচার মন দিয়া শোনা বুদ্ধিবৃত্তির একটি ভাল ব্যায়াম হইতে পারে, মনোযোগ সহকারে অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনিলে বুদ্ধির পরিতৃপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি তাহারও পরের কথা জানিতে চাও, তবে শুধু বক্তৃতা শুনিলে হইবে না। বক্তৃতায় ইহা শেখানো যায় না, কারণ ইহা জীবন-গঠনের কথা। আর জীবনই অপরের ভিতর জীবন সঞ্চার করিতে পারে। তোমাদের ভিতর যদি কেহ ইহা শিখিতে সত্যই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে পরম আনন্দের সহিত আমি তাহাকে সাহায্য করিব।

৩. আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার ঐরূপ এক আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচার্য বিষয় ছিল–'আত্ম-বস্তু কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যোগ্য?' বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলেন, যাহা তিনি পাশ্চাত্যখণ্ডে সেই প্রথমই শ্রবণ করেন নাই; প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেনঃ

একটি প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ স্ত্রীজাতির কোন আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না–এইপ্রকার যে উক্তি এখানে আমাদের নিকট করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহু দিনের এবং তাঁহারা এই ভ্রমটি ধরিয়া রাখিতে পছন্দ করেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের প্রকৃতির ইহা একটি অদ্ভুত ধারা যে, সে যাহাদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে এমন কিছু প্রচার করিতে চায়, যাহা খুবই খারাপ। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, আমি মুসলমান নই, কিন্তু উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং আমি দেখিয়াছি, কোরানে এমন একটিও উক্তি নাই, যাহার অর্থ নারীর আত্মা নাই; বস্তুতঃ কোরান বলেন, নারীর আত্মা আছে।

আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় আজ আলোচিত হইল; সে-সম্পর্কে আমার এখানে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই, কারণ প্রথমেই প্রশ্ন উঠেঃ 'আত্মিক বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে কিনা?' আপনারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে কি বোঝেন? প্রথমতঃ প্রত্যেক বিষয়কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় দিক্ হইতে দেখা আবশ্যক। যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সহিত আমরা খুবই পরিচিত, এবং যেগুলি আমরা খুবই পড়িয়াছি,

ঐগুলির কথাই ধরা যাক। ঐগুলি সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য যে, ঐ দুই বিদ্যার অতি সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষণও জগতের যে-কোন ব্যক্তি অনুধাবন করিতে পারে? একটি মূর্খ চাষাকে ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রদর্শন করুন; সে উহার কি বুঝিবে? কিছুই না। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বুঝিবার মত অবস্থায় উপনীত হইবার আগে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার পূর্বে সে এই-সব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহা এই ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড অসুবিধা। যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ অর্থে ইহাই বুঝিতে হয় যে, কতগুলি তথ্যকে এমন সাধারণ স্তরে নামাইয়া আনা হইবে যে, ঐগুলি সকল মানুষের পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয় হইবে, ঐগুলি সকলের দ্বারা অনুভূত হইবে, তাহা হইলে কোন বিষয়ে যে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভব—ইহা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের যত বিশ্ববিদ্যালয় এবং যত শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবই বৃথা হইত। যদি শুধু মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ই আমরা বুঝিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি কেন? এত অধ্যয়ন-অনুশীলনই বা কেন? এই-সবের তো কোন মূল্যই নাই। সুতরাং আমরা বর্তমানে যে স্তরে আছি, জটিল বিষয়সমূহ সেখানে নামাইয়া আনাকেই যদি বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, তবে এই কথা শ্রবণমাত্র নির্বিচারে বলা চলে যে, তাহা এক অসম্ভব ব্যাপার। অতঃপর আমরা যে অর্থ ধরিতেছি, তাহাই নির্ভুল হওয়া উচিত। তাহা হইল এই যে, কতগুলি জটিলতর তত্ত্ব প্রমাণের জন্য অপর কতগুলি জটিল তত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক। এই জগতে কতগুলি অধিকতর জটিল, দুরূহ বিষয় আছে, যেগুলি আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প জটিল বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং হয়তো এই উপায়ে উক্ত বিষয়সমূহের নিকটতর জ্ঞান লাভ করি; এইরূপে ক্রমে এগুলিকে আমাদের বর্তমান সাধারণ জ্ঞানের স্তরে নামাইয়া আনা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল ও যত্নসাপেক্ষ এবং ইহার জন্যও বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণ শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এই সম্পর্কে আমি এইটুকুই বলিতে চাই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইতে হইলে শুধু যে বিষয়ের দিক্ হইতেই সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন আছে, তাহা নয়; যাহারা এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দিক্ হইতেও যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন। এই-সব শর্ত পূর্ণ হইলেই কোন

ঘটনাবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে যখন প্রমাণ বা অপ্রমাণ উপস্থাপিত হইবে, তখন আমরা হাঁ বা না বলিতে পারিব। কিন্তু তৎপূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অথবা যে-সকল ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে পুনঃপুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রমাণ করা অতি দুরূহ বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর স্বপ্ন হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, এই জাতীয় যে-সব ব্যাখ্যা অতি অল্প চিন্তার ফলে প্রসূত হইয়াছে, সেগুলির প্রসঙ্গে আসিতেছি। যাঁহারা এই-সব ব্যাখ্যা অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিবেন—এই ধরনের অভিমত কেবল অসার কল্পনামাত্র। ধর্ম স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত—এই মত যদিও অতি সহজভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি এইরূপ কল্পনা করার কোন হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐরূপ হইলে অতি সহজেই অজ্ঞেয়বাদীর মত গ্রহণ করা চলিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিষয়টির অত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন কি আধুনিককালেও নিত্য নূতন অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। এইগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল হইবে কেন, এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান হইয়া আসিতেছে। অন্ধ বলে—সূর্য নাই। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, সূর্য সত্যই নাই। বহু বৎসর পূর্বেই এই-সব ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। কত কত জাতি সমগ্রভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিজদিগকে স্নায়ুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যকলাপ আবিষ্কারের উপযুক্ত যন্ত্র করিয়া তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাহাদের আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণাদি বহু যুগ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, এই-সব বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সব দেশে এমন অনেক নর-নারী আজও বর্তমান আছেন, যাঁহারা এই ঘটনারাশির জীবন্ত প্রমাণ। অবশ্য আমি স্বীকার করি, এক্ষেত্রে প্রচুর ভণ্ডামি আছে এবং ইহার মধ্যে প্রতারণা ও মিথ্যা অনেক পরিমাণে বর্তমান। কিন্তু এই-সব কোন্ ক্ষেত্রে নাই? যে-কোন একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ই ধরা যাক না কেন; সন্দেহাতীত সত্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কিংবা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন—এইপ্রকার তত্ত্ব মাত্র দুই-তিনটিই আছে, অবশিষ্ট সবই শূন্যগর্ভ কল্পনা। অজ্ঞেয়বাদী নিজের অবিশ্বাস্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে চান, নিজের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখুন না। দেখিবেন—তাহার অর্ধেক ভিত্তিমূলসহ

ধসিয়া পড়িবে। আমরা অনুমান-কল্পনার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, মানবাত্মার ইহাই স্বাভাবিক প্রগতি। একদিকে অজ্ঞেয়বাদী, অপরদিকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধানী—এই উভয়বৃত্তি সম্পন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। এইজন্য আমাদের নিজ সীমার ঊর্ধ্বে যাওয়া প্রয়োজন; যাহা অজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত, তাহা জানিবার জন্য কঠিন প্রয়াস করিতে হইবে, এবং এই সংগ্রাম অপ্রতিহতভাবে চলা চাই।

অতএব—বক্তা অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়া আমি এই মত উপস্থাপিত করিতেছি যে, প্রেতাত্মাদের নিকট হইতে শব্দ অবলম্বনে সাড়া পাওয়া, কিংবা টেবিলে আঘাতের শব্দ শোনা প্রভৃতি যে-সব ঘটনাকে ছেলেখেলা বলে, অথবা অপরের চিন্তা জানিতে পারা প্রভৃতি যে-সব শক্তি আমি বালকদের মধ্যেও দেখিয়াছি, কেবল এই-সব সামান্য সামান্য ব্যাপারই নয়, পরন্তু যে-সব ঘটনাকে পূর্ববর্তী বক্তা উচ্চতর অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—কিন্তু যাহাকে আমি মনেরই অতি-চেতন অভিজ্ঞতা বলিতে চাহিতেছি—সেই-সবের অধিকাংশই হইতেছে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রথম সোপান মাত্র। প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—মন সত্যই সেই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে কিনা। আমার ব্যাখ্যা অবশ্য উক্ত বক্তার ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইবে; তথাপি পরস্পরের ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ঠিক করিয়া লইলে হয়তো আমরা উভয়েই একমত হইতে পারিব। আমাদের সম্মুখে যে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবানুভূতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পরেও সম্প্রতি যে প্রকার চেতনা আছে, তাহা থাকে কিনা—এই প্রশ্নের উপর খুব বেশী কিছু নির্ভর করে না। সত্তার সহিত অনুভূতি যে সব সময় থাকিবেই—এমন কোন কথা নাই। আমার নিজের এবং আমাদের সকলেরই শরীর সম্পর্কে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার খুব অল্প অংশেরই সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং ইহার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমরা অচেতন। তবু শরীরের অস্তিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিজ মস্তিষ্ক সম্পর্কে কেহই সচেতন নয়। আমি আমার মস্তিষ্ক কখনই দেখি নাই, এবং ইহার সম্পর্কে আমি কোন সময়েই

সচেতন নই। তথাপি আমি জানি, মস্তিষ্ক আছে। অতএব এইরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা অনুভূতির জন্য লালায়িত; বস্তুতঃ আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্বের জন্য আগ্রহান্বিত, যাহা এই স্থূল জড়বস্তু হইতে ভিন্ন এবং ইহা অতি সত্য যে, এই জ্ঞান আমরা এই জীবনেই লাভ করিতে পারি, এই জ্ঞান ইতঃপূর্বে অনেকেই লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার সত্যতা ঠিক তেমনিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যেভাবে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এই-সব বিষয় আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। উপস্থিত সকলকে আমি আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথা মনে রাখা ভাল যে, আমরা প্রায়ই এই-সব ব্যাপারে প্রতারিত হই। কোন ব্যক্তি হয়তো আমাদের সম্মুখে এমন একটি ব্যাপারের প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, যাহা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ, কিন্তু আমরা তাহা এই যুক্তি অবলম্বনে অস্বীকার করিলাম যে, আমরা উহা সত্য বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত বিষয় সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা সেই-সব প্রমাণ অনুধাবন করিবার উপযুক্ত কিনা এবং আমরা আমাদের দেহমনকে ঐ-সব আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারের উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছি কিনা, তাহা বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যাই।

৪. রাজযোগের লক্ষ্য

ধর্মজীবনে ধ্যান-ধারণার দিকটিই যোগের লক্ষ্য, নৈতিক দিকটি নয়, যদিও কার্যকালে নীতিবিষয়ক আলোচনা কিছুটা আসিয়াই পড়ে। ভগবানের বাণী বলিয়া যাহা পরিচিত, শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জগতের নর-নারীর মন সত্য সম্বন্ধে আরও অধিক অনুসন্ধানপরায়ণ হয়। তাহারা নিজে কিছু সত্য উপলব্ধি করিতে চায়। ধর্মের বাস্তবতা নির্ভর করে একমাত্র উপলব্ধির উপর। মনের অতিচেতন ভূমি হইতেই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সত্য আহরণ করিতে হয়। বিশেষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহারা যে ভূমিতে উঠিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে আমাদেরও উঠিতে হইবে; সেখানে উঠিয়া আমরা যদি একই ধরনের অনুভূতি লাভ করি, তাহা হইলেই আমাদের কাছে সেগুলি সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অপরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সবই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি; যাহা একবার ঘটিয়াছে, পুনর্বার তাহা ঘটিতে পারে; ঘটিতে পারে নয়, একই পরিবেশে আবার তাহা ঘটিতে বাধ্য। এই অতিচেতন অবস্থায় কিভাবে পৌঁছাইতে হয়, রাজযোগ তাহা শিক্ষা দেয়। সব বড় বড় ধর্মই কোন-না-কোন ভাবে এই অতিচেতন অবস্থাকে স্বীকার করে; কিন্তু ভারতে ধর্মের এই দিকটির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় কয়েকটি বাহ্য প্রক্রিয়া এই অবস্থালাভের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু শুধু এই ধরনের বাহ্য প্রক্রিয়া অবলম্বনে কখনও বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। নির্দিষ্ট আসন, নির্দিষ্ট প্রণালীতে শ্বাস-ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শান্ত ও একাগ্র হয়; কিন্তু এগুলির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং ভগবান্-লাভের বা সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই-ই। স্থির হইয়া বসিয়া একটি ভাবের উপর মন নিবিষ্ট করিবার ও মনকে সেখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গেলেই অধিকাংশ লোক অনুভব করিবে যে, উহাতে সফল হইবার জন্য বাহিরের কিছু সহায়তার প্রয়োজন আছে। মনকে ধীরে ধীরে এবং যথানিয়মে বশে আনিতে হয়। ধীর, নিরবচ্ছিন্ন এবং অধ্যবসায়যুক্ত সাধনসহায়ে ইচ্ছাশক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। ইহা ছেলেখেলা নয়, একদিন চেষ্টা করিয়া পরদিন ছাড়িয়া দিবার মত খেয়ালও নয়। সারা জীবনের কাজ

এইটি; আর যে লক্ষ্য-লাভের জন্য এ প্রচেষ্টা, তাহা পাইবার জন্য যত মূল্যই আমাদিগকে দিতে হউক না কেন, সে মূল্য উহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; কারণ আমাদের লক্ষ্য হইল ভগবৎসত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্বানুভূতি। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, এবং ঐ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিতে পারি—এই বোধ থাকিলে তাহা লাভের জন্য কোন মূল্যকেই আর অত্যধিক বলিয়া মনে হইতে পারে না।

৫. একাগ্রতা

১৯০০ খ্রীঃ ১৬ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কো শহরে 'ওয়াশিংটন হল'-এ প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর কথা ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ... দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার শব্দ বা বাক্যগুলি স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য অনুলেখিকা কর্তৃক নিবদ্ধ। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রের মুখপত্র ' Vedanta and the West' পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

বহির্জগতের অথবা অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা একটি মাত্র উপায়ে লাভ করি–উহা মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সম্ভবপর হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমরা মন একাগ্র করিতে না পারি। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন, ... এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মনের রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়া উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এই জগতে এক মনের সঙ্গে অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। দুইজনের মধ্যে যাহার একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকেই 'প্রতিভাশালী' বলা হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের মতে–দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকিলে আমরা সকলেই প্রতিভাবান্ হইতে পারি। কেহ কেহ হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু দ্রুতগতিতেই সম্পন্ন করেন। ইহা আমরা সকলেই করিতে পারি। ঐ শক্তি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। মনকে জানিবার জন্য উহাকে কিভাবে একাগ্র করা যায়, তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্তু। যোগিগণ মনঃসংযমের যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ রাত্রে ঐগুলির কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি।

অবশ্য—মনের একাগ্রতা নানাভাবে আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে একাগ্রতা আসিতে পারে। সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়; কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া। ... এরূপ লোকও আছে, যাহারা তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটার আসনে শুইয়া বা ধারাল নুড়িগুলির উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়া থাকে। এগুলি সাধারণ নিয়ম নয়, এই প্রণালী খুবই অবৈজ্ঞানিক। মনকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

কেহ উর্ধ্ববাহু হইয়া মন একমুখী করে। শারীরিক ক্লেশই তাহাকে ঈপ্সিত একাগ্রতা লাভ করাইতেছে। কিন্তু এই-সবই অস্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এই-সম্বন্ধে কতকগুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে, উহা অতিক্রম করিয়া মনের অতিচেতন অবস্থায় পৌঁছানোই আমাদের লক্ষ্য। চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলিয়াই যোগীর নিকট নীতিশাস্ত্রের মূল্য। মন যত পবিত্র হইবে, উহা সংযত করাও তত সহজ হইবে। মনে যে-কোন চিন্তা উঠুক না কেন, মন উহা ধারণ বা গ্রহণ করিয়া বাহিরের কর্মে রূপায়িত করে। যে-মন যত স্থূল, উহাকে বশ করা ততই কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন করা কখনও সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো সে কিছু মনঃসংযম করিতে পারিল, কিছু সফলতাও আসিতে পারে, হয়তো বা একটু দূরশ্রবণশক্তি লাভ হইল ... কিন্তু এই শক্তিগুলিও তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। মুশকিল এই যে, অনেক ক্ষেত্রে যে-সকল অসাধারণ শক্তি তাহার আয়ত্তে আসিয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ঐগুলি কোন নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে অর্জিত হয় নাই। যাহারা যাদুবলে সর্প বশীভূত করে, তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই। ... কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে তো সে পরিণামে ঐ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে। তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মহত্যা করে।

মনঃসংযমের অনুশীলন—বিজ্ঞানসম্মত, ধীর, শক্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভাবে শিক্ষা করা উচিত। প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরায়ণ হওয়া। এইরূপ ব্যক্তি দেবতাদের নামাইয়া আনিতে চান, এবং দেবতারাও মর্ত্যধামে নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সারকথা হইল সম্পূর্ণভাবে সুনীতিপরায়ণ হওয়া। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—ইহার অর্থ কি? কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা ও কঠোরতা—এইগুলি একান্ত আবশ্যক। একবার ভাবিয়া দেখ—কাহারও মধ্যে যদি এই সব গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয় তো ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই, বল দেখি? যদি কেহ কোন জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাবশূন্য হন … (তাঁহার সমক্ষে) প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ করিবে। যোগমার্গের আচার্যগণ সুকঠিন নিয়মাবলী সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। … (সেগুলি পালন না করিলে কেহই যোগী হইতে পারিবে না) যেমন দানশীল না হইলে কেহ 'দাতা' আখ্যা লাভ করিতে পারে না। …

তোমরা বিশ্বাস করিবে কি—আমি এমন একজন যোগী পুরুষ১ দেখিয়াছি, যিনি ছিলেন গুহাবাসী, এবং সেই গুহাতেই বিষধর সর্প ও ভেক তাঁহার সঙ্গেই একত্র বাস করিত; তিনি কখনও কখনও দিনের পর দিন মাসের পর মাস উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। সর্বদাই চুপচাপ থাকিতেন। একদিন একটা চোর আসিল। … সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি-করা জিনিষের পোঁটলাটি ফেলিয়া পলাইল। সাধু পোঁটলাটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার পদপ্রান্তে পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি কাতরভাবে জিনিষগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এগুলি আমার নয়, তোমার।'

আমার বৃদ্ধ আচার্যদেব বলিতেন, 'ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে জোটে।' এরূপ লোক এখনও আছেন। তাঁহাদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না। … যখন মানুষ অন্তরের অন্তস্তলে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই

(তাঁহার সম্মুখে) হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করে। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। মানুষের সহিত আচরণের জন্য এগুলি আবশ্যক। ... সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। ... অপরের দোষত্রুটি দেখিয়া বেড়ান তো আমাদের কাজ নয়। উহাতে কোন উপকার হয় না। এমন কি, ঐগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। সৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো মিস অমুক আসিয়া এখানে হাজির; বলিলেন, 'আমি যোগসাধনা করব।' বিশ বার তিনি নিজের অভিপ্রায়ের কথা অপরের কাছে বলিয়া বেড়াইলেন। হয়তো ৫০ দিন ধ্যান অভ্যাস করিলেন। পরে বলিলেন, 'এই ধর্মে কিছুই নেই; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই।'

(ধর্মজীবনের) ভিত্তিই সেখানে নাই। ধার্মিক হইতে হইলে এই পূর্ণ নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্যক)। ইহাই কঠিন কথা। ...

আমাদের দেশে নিরামিষভোজী সম্প্রদায়সমূহ আছে। ইহারা প্রত্যুষে পিপীলিকার জন্য সেরের পর সের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া দেয়। একটি গল্প শোনা যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিঁপড়াদের চিনি দিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াগুলি মাড়াইয়া ফেলে। 'হতভাগা, তুই প্রাণিহত্যা করলি!' বলিয়া প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে এমন এক ঘুষি মারে যে, লোকটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

বাহ্য পবিত্রতা অত্যন্ত সহজসাধ্য, এবং সারা জগৎ (উহার) দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে। কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যদি নৈতিকতার পরিমাপক হয়, তবে যে-কোন মূর্খই তো তাহা পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মন লইয়াই যখন সংগ্রাম, তখন উহা কঠিন ব্যাপার। শুধু বাহিরের কৃত্রিম জিনিষ লইয়া যাহারা থাকে, তাহারা নিজে নিজেই এত ধার্মিক বনিয়া উঠে! মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। (একবার বাইবেলে বিবাহভোজের বিষয়টি পড়ি।) অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে থাকি, 'অহো, তিনি মদ ও মাংস খেয়েছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধুপুরুষ হতে পারেন না।'

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সব সময়েই যেন আমাদের নজর এড়াইয়া যায়। সামান্য বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূর্খেরাও তো উহা দেখিতে পারে। কিন্তু অশন-বসনের বাহিরে দৃষ্টি যায় কয়জনের? হৃদয়ের শিক্ষাই আমাদের কাম্য। ... ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখনও কখনও দিনে বিশ-বার স্নান করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্যন্ত তাহারা কুণ্ঠিত হয়। ... স্থূল ব্যাপার, বাহ্য আচার মাত্র! (শুধু স্নান করিয়াই যদি পবিত্র হওয়া যাইত) তবে তো মৎস্যকুলই সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী।

স্নান, পোষাক, খাদ্যবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য তখনই, যখন এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক হয়। ... আধ্যাত্মিকতার স্থান প্রথমে, এগুলি সহায়কমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যদি না থাকে, তবে যতই ঘাসপাতা খাওয়া যাক না কেন, কোনই কল্যাণ নাই। ঠিকমত বুঝিলে এগুলি জীবনে অগ্রগতির পথে সাহায্য করে, নচেৎ উন্নতির পরিপন্থী হয়।

এইজন্যই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ সকল ধর্মেই অজ্ঞলোকদের হাতে পড়িয়া সব কিছুরই অবনতি হয়। বোতলে কর্পূর ছিল, সমস্তটাই উবিয়া গেল—এখন শূন্য বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি।

আর একট কথা। ... (আধ্যাত্মিকতার) লেশমাত্রও থাকে না, যখন লোকে বলিতে আরম্ভ করে, 'আমারটাই ভাল, তোমার যা-কিছু সবই মন্দ।' মতবাদ ও বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি লইয়াই বিবাদ, আত্মায় বা শাশ্বত সত্যে কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গৌরবময় ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয়া গেল। ... (খ্রীষ্টধর্মেও এইরূপ।) তারপর যখন কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে এবং তাঁহার স্বরূপ জানিতে চায় না, তখন কলহের সূত্রপাত হয়—এক ঈশ্বরে তিনটি ভাব, না ত্রিত্বভাবে এক ঈশ্বর! স্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌঁছিয়া আমাদিগকে জানিতে হইবে—তিনি 'একে তিন, না তিনে এক।'

এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা। মনঃসংযোগের চেষ্টায় কোন একটি আসনের প্রয়োজন। যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড সরল ও সহজভাবে রাখাই নিয়ম। মেরুদণ্ড শরীরের ভার বহিবার জন্য নয়। ... আসন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয়—যে আসনে মেরুদণ্ডকে শরীরের ভারমুক্ত করিয়া সহজ ও সরলভাবে রাখা যায়, সে-আসনেই বস।

ইহার পর (প্রাণায়ামের) ... শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম। ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ... যাহা বলিতেছি, তাহা ভারতের কোন সম্প্রদায়বিশেষ হইতে সংগৃহীত একটা শিক্ষা নয়। ইহা সর্বজনীন সত্য। যেমন এই দেশে তোমরা ছেলেমেয়েদের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রার্থনা শিক্ষা দাও, (ভারতবর্ষে) বালকবালিকাদের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা হয় ...।

দুই-একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্মের কোন মতবাদ ভারতের শিশুদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় না। পরে তাহারা নিজেরাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এমন কাহারও অন্বেষণ করে, যাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে পারা যায়। অনেকের কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সন্ধান পাইয়া বলে, 'ইনিই আমার গুরু!' তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। আমি যদি বিবাহিত হইতাম, আমার স্ত্রী অন্য একজনকে গুরু গ্রহণ করিতে পারিত, আমার পুত্র অন্য কাহাকেও গুরু করিতে পারিত; দীক্ষার কথা কেবল আমার এবং আমার গুরুর মধ্যেই সর্বদা গুপ্ত থাকে। স্ত্রীর সাধনপ্রণালী স্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। স্বামী তাঁহার স্ত্রীর সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেন-না ইহা সুবিদিত যে, নিজের সাধনপ্রণালী কেহ কখনও বলিবে না। ইহা যে-কোন গুরু ও শিষ্যের জানা আছে, ... অনেক সময় দেখা যায়, যাহা একজনের নিকট হাস্যাস্পদ, তাহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। ... প্রত্যেকেই নিজের বোঝা বহিতেছে; যাহার মনটি যেভাবে গঠিত, সেইভাবেই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যেগুলি সকল আচার্যই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল

ভারতীয় উপাসনাপ্রণালী। গঙ্গার তীরে আমরা দেখিতে পাইব—কত নর-নারী ও বালক-বালিকা প্রাণায়াম ও পরে ধ্যান (অভ্যাস) করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাহারা প্রাণায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ইহাকেই জীবনের প্রধান অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নানা প্রণালী অভ্যাস করে। চুরাশি প্রকার পৃথক্ পৃথক্ আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশে চলে, তাহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

ইহার পরেই আসে 'ধারণা' (একাগ্রতা)। ... মনকে দেহের কতকগুলি স্থানবিশেষে ধরিয়া রাখার নাম 'ধারণা'। হিন্দু বালক-বালিকা ... দীক্ষা গ্রহণ করে। সে গুরুর নিকট হইতে একটি মন্ত্র পায়। ইহাকে বীজমন্ত্র বলে। গুরু এই মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের গুরুর নিকট হইতে। এইভাবে মন্ত্রগুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। 'ওঁ' এইরূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ আছে। এই অর্থ গোপনে রাখা হয়, লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করেন না। গুরুর কাছে কানে শুনিয়া মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া শিষ্য উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিতে থাকে।

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও ঐভাবে উপাসনা করিয়াছি। বর্ষাকালে একটানা চার মাস ধরিয়া প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের পর গঙ্গাস্নান ও আর্দ্র বস্ত্রে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্য ভাত বা অন্য কিছু। বর্ষাকালে এইরূপ চাতুর্মাস্য।

মানুষের সামর্থ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই নাই—ভারতীয় মনের ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহাকে কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যায়। ভারতে কিন্তু এমন লোকও আছে, যে বিশ্বাস করে—মন্ত্রশক্তির দ্বারা অর্থলাভ সম্ভব। তাই সেখানে দেখা যাইবে যে, ধনাকাঙ্ক্ষী হয়তো বৃক্ষতলে বসিয়া মন্ত্রের মাধ্যমে ধন কামনা করিতেছে। (চিন্তার) শক্তিতে সব-কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য। এখানে তোমরা যে ধন উপার্জন কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার। তোমরা ধনোপার্জনের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ কর। কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'হঠযোগী'।

… তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর হাত হইতে শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। … তাঁহাদের সমস্ত সাধন শরীর-সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ বৎসরের সাধন! সেইজন্য অল্প বয়স হইতে আরম্ভ না করিলে ইহা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। … হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন আছে; হঠযোগী যখন প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে একাকী ঠিক চল্লিশ দিন আসিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াগুলি একে একে যথারীতি অভ্যাস করিতে হয় এবং শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে হয়। …

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বাঁচিয়া আছে বলিয়া দাবী করে। সকলেই আমাকে বলিয়াছে যে, তাহাদের পিতামহেরাও এই লোকটিকে দেখিয়াছিল। … তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কুড়ি মাইল করিয়া বেড়ান। ইহাকে ভ্রমণ না বলিয়া দৌড়ান বলাই ভাল। তারপর কোন জলাশয়ে গিয়া আপাদমস্তক কাদা মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার জলে ডুব দেন, আবার কাদা মাখেন। … এই-সবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। (লোকে বলে সাপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে।) সম্ভবতঃ লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমি ১৪ বৎসর ভারত ভ্রমণ করিয়াছি এবং যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি–প্রত্যেকে তাহার কথা জানে। লোকটি সারা জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছে। … (হঠযোগী) ৮০ ইঞ্চি লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে। হঠযোগীকে দৈনিক চার বার শরীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ ধুইতে হয়।

প্রাচীরগুলিও তো সহস্র সহস্র বৎসর অটুট থাকিতে পারে। … তাহাতে হয়ই বা কি? এত দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা আমার নাই। ‘এক দিনের বিপর্যয়রাশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!’ সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও দোষত্রুটিতে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট।

অন্যান্য সম্প্রদায় আছে …। তাহারা তোমাদিগকে সঞ্জীবনী সুরা একফোঁটা দেয় এবং উহা খাইয়া তোমাদের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে। … কত যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে–সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মাস লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দিকে (জড়-জগতের মধ্যেই)। প্রতিদিন এক-একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি …।

ঐ-সকল সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস মন। মনকে বশীভূত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মন একাগ্র করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, দেহের ভিতর মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে বা স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে মন স্থির রাখিতে পারিলে যোগী দেহের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। যোগীর পক্ষে শান্তিলাভের প্রধান বিঘ্ন ও উচ্চতম আদর্শের পরিপন্থী হইল এই দেহ। সেইজন্য তিনি চান দেহকে বশীভূত করিতে এবং ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে।

এইবার ধ্যানের কথা। ধ্যানই সর্বোচ্চ অবস্থা। ... যখন (মনে) সংশয় থাকে, তখন উহার অবস্থা উন্নত নয়। ধ্যানই মনের উচ্চ অবস্থা। উন্নত মন বিষয়সমূহ দেখে বটে, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলে না। যতক্ষণ আমার দুঃখের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সুখ বা আনন্দ বোধ করি, আমি দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছি। কিন্তু সুখ দুঃখ দুই-ই যখন সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তখনই হয় উচ্চ অবস্থা। ... ধ্যানমাত্রই সাক্ষাৎ অতিচেতন-বোধ। পূর্ণ মনঃসংযমে জীবাত্মা স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে যথার্থই মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন জীবাত্মা যাহা চায়, তাহাই পায়। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানে পূর্ব হইতেই আছে। জীবাত্মা শক্তিহীন জড়ের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া মরে, হায় হায় করে। নশ্বর বস্তুসমূহের সহিত জীবাত্মা নিজেকে মিশাইয়া ফেলে। ... কিন্তু যদি সেই মুক্ত আত্মা কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে চান, তবে তিনি তাহা পাইবেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে না চান, তাহা হইলে উহা পাইবেন না। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরই হইয়া যান। এইরূপ মুক্ত পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁহার আর জন্মমৃত্যু নাই। তিনি চিরমুক্ত।

৬. একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়া

মন একাগ্র করিবার ক্ষমতার তারতম্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। যে-কোন কাজে সাফল্যের মূলে আছে এই একাগ্রতা। একাগ্রতার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। ইহার ফল প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। সঙ্গীত, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে আমাদের যে উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, তাহা এই একাগ্রতা-প্রসূত। একাগ্রতার ক্ষমতা পশুদের একরকম নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা পশুদের শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পশুকে যাহা শেখান হয়, তাহা সে ক্রমাগত ভুলিয়া যায়; কোন বিষয়ে একসঙ্গে অধিকক্ষণ মন দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই—মন একাগ্র করার ক্ষমতা পশুর চেয়ে মানুষের অনেক বেশী। মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণও আবার এই একাগ্রতার তারতম্য। সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে একাগ্রতার মাত্রার বিভিন্নতাই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। পার্থক্য শুধু এইখানেই। সকলেরই মন সময়ে সময়ে একাগ্র হইয়া যায়। যাহা আমাদের প্রিয়, তাহারই উপর আমরা সকলে মনোনিবেশ করি; আবার যে বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তাহাই প্রিয় হইয়া উঠে। এমন মা কি কেহ আছেন, নিজের ছেলের অতিসাধারণ মুখখানিও যিনি ভালবাসেন না? মায়ের কাছে সেই মুখখানিই জগতের সুন্দরতম মুখ। মন সেখানে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই মুখখানি তাঁহার প্রিয় হইয়াছে। সকলেই যদি ঠিক সেই মুখখানির উপর মন বসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার উপর সকলেরই ভালবাসা জন্মিত; সকলেই ভাবিত, এমন সুন্দর মুখ আর হয় না। যাহা ভালবাসি, তাহারই উপর আমরা মনোনিবেশ করি। সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণকালে আমাদের মন সেই সঙ্গীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন সরাইয়া লইতে পারি না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাতে যাহাদের মন একাগ্র হয়, সাধারণ পর্যায়ের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না। ইহার বিপরীতটিও সত্য। দ্রুত-লয়ের সঙ্গীত-শ্রবণমাত্র মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ছেলেরা হালকা সঙ্গীত পছন্দ করে, কারণ তাহাতে লয়ের দ্রুততা মনকে বিষয়ান্তরে

চলিয়া যাইবার কোন অবকাশই দেয় না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত জটিলতর, এবং তাহা অনুধাবন করিতে হইলে অধিকতর মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন; সেইজন্যই সাধারণ সঙ্গীত যাহারা ভালবাসে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না।

এই ধরনের একাগ্রতার সব চেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, মন আমাদের আয়ত্তে থাকে না, বরং মনই আমাদের চালিত করে। যেন সম্পূর্ণ বাহিরের কোন বস্তু আমাদের মনটিকে টানিয়া লইয়া যতক্ষণ খুশী নিজের কাছে ধরিয়া রাখে। সুমধুর সঙ্গীত-শ্রবণকালে অথবা মনোরম চিত্রদর্শনকালে আমাদের মন উহাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া যায়; মনকে আমরা সেখান হইতে তুলিয়া আনিতে পারি না।

আমি যখন তোমাদের মনোমত কোন বিষয়ে ভাল বক্তৃতা দিই, তখন আমার কথায় তোমাদের মন একাগ্র হয়। তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের মনকে কাড়িয়া আনিয়া আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উহাকে ঐ প্রসঙ্গের মধ্যে ধরিয়া রাখি। এভাবে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইয়া একাগ্র হয়। আমরা তাহাতে বাধা দিতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চেষ্টা করিয়া এই একাগ্রতা বাড়াইয়া তোলা ও ইচ্ছামত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা। যোগীরা বলেন, হাঁ, তাহা সম্ভব; তাঁহারা বলেন, আমরা মনকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারি। নৈতিক দিক্ হইতে একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলায় বিপদও আছে; কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিবার পর ইচ্ছামাত্র সেখান হইতে সে-মন তুলিয়া লইতে না পারিলেই বিপদ। এরূপ পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। মন তুলিয়া লইবার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল দুঃখের কারণ। কাজেই একাগ্রতার শক্তি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মন তুলিয়া লইবার শক্তিও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। বস্তুবিশেষে মনোনিবেশ করিতে শিখিলেই চলিবে না। প্রয়োজন হইলে মুহূর্তের মধ্যে সেখান হইতে মন সরাইয়া লইয়া বিষয়ান্তরে তাহাকে নিবিষ্ট করিতে পারা চাই। এই উভয় ক্ষমতা সমভাবে অর্জন করিয়া চলিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাই মনের প্রণালীবদ্ধ ক্রমোন্নতি। আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তারপর ওভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশীমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।

আমার সাধনা বরাবর একমুখী ছিল। ইচ্ছামত মন তুলিয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন না করিয়াই আমি একাগ্রতার শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলাম; ইহাই হইয়াছে আমার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগের কারণ। এখন আমি খুশীমত মন তুলিয়া লইতে পারি; তবে ইহা শিখিতে হইয়াছে অনেক পরে।

কোন বিষয়ে ইচ্ছামত আমরা নিজেরাই যেন মনোনিবেশ করিতে পারি; বিষয় যেন আমাদের মনকে টানিয়া না লয়। সাধারণতঃ বাধ্য হইয়াই আমরা মনোনিবেশ করি; বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণের প্রভাবে আমাদের মন সেখানে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, আমরা তাহাকে বাধা দিতে পারি না। মনকে সংযত করিতে হইলে—যেখানে ইচ্ছা করিব ঠিক সেখানেই তাহাকে নিবিষ্ট করিতে হইলে—বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন; অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবার নয়। ধর্মের অনুশীলনে মনঃসংযম একান্ত প্রয়োজন। এ অনুশীলনে মনকে ঘুরাইয়া মনেরই উপর নিবিষ্ট করিতে হয়।

মনের নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করিতে হয় প্রাণায়াম হইতে। নিয়মিত শ্বাস-ক্রিয়ার ফলে দেহে সমতা আসে; তখন মনকে ধরা সহজ হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই আসন বা দেহসংস্থানের কথা ভাবিতে হয়। যে-কোন ভঙ্গিতে অনায়াসে বসিয়া থাকা যায়, তাহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড যেন ভারমুক্ত থাকে, দেহের ভার যেন বক্ষ-পঞ্জরের উপর রাখা হয়। কোন স্বকপোলকল্পিত কৌশল অবলম্বনে মন-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিও

না, একমাত্র সহজ, সরল শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াই এ-পথে যথেষ্ট। বিবিধ কঠোর সাধন-সহায়ে মনকে একাগ্র করিতে প্রয়াসী হইলে ভুল করা হইবে। সে-সব করিতে যাইও না।

মন শরীরের উপর কার্য করে, আবার শরীরও মনের উপর ক্রিয়াশীল। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থা শরীরে ফুটিয়া উঠে, আবার শরীরের প্রতিটি ক্রিয়ার অনুরূপ ফল প্রকটিত হয় মনের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনকে দুটি আলাদা বস্তু বলিয়া ভাবিলেও কোন ক্ষতি নাই, আবার দুটি মিলিয়া একটি-ই শরীর—স্থূল দেহ তাহার স্থূল অংশ, আর মন তাহার সূক্ষ্ম অংশ—এরূপ ভাবিলেও কিছু আসে যায় না। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। মন প্রতিনিয়ত শরীরে রূপায়িত হইতেছে। মনকে সংযত করিতে হইলে প্রথমে শরীরের দিক্ হইতে আরম্ভ করা বেশী সহজ। মন অপেক্ষা শরীরের সঙ্গে সংগ্রাম করা অনেক সহজ কাজ।

যে যন্ত্র যত বেশী সূক্ষ্ম, তাহার শক্তিও তত বেশী। মন শরীরের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এজন্য শরীর হইতে আরম্ভ করিলে কাজ সহজ হয়।

প্রাণায়াম হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে শরীর-অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া মনের কাছে পৌঁছান চলে। এভাবে চলিতে চলিতে শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তারপর শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি; ক্রমে সূক্ষ্মতর ও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি, অবশেষে মনের কাছে গিয়াই পৌঁছাই। শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অনুভূতিতে আসামাত্র সেগুলি আয়ত্তে আসে। কিছুকাল পরে শরীরের উপর মনের কার্যগুলিও অনুভব করিতে পারিবে। মনের একাংশ যে অপরাংশের উপর কাজ করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিবে; এবং মন যে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগাইতেছে, তাহাও অনুভব করিবে; কারণ মনই স্নায়ুমণ্ডলীর নিয়ন্তা ও অধীশ্বর। বিভিন্ন স্নায়ুস্পন্দন অবলম্বনে মনই ক্রিয়া করিতেছে, ইহাও টের পাইবে।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে—প্রথমে স্থূল শরীরের উপর ও পরে সূক্ষ্মশরীরের উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে মনকে আয়ত্তে আনা যায়।

প্রাণায়ামে প্রথম ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও খুবই স্বাস্থ্যকর। ইহার অভ্যাসে আর কিছু না হউক স্বাস্থ্যলাভ ও শরীরের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হইবেই। বাকী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে ও সাবধানে করিতে হয়।

৭. প্রাণায়াম

প্রাণায়াম বলিতে কি বোঝায়, প্রথমে আমরা তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে। দার্শনিকদের মতে এই সৃষ্টি তরঙ্গাকারে চলে; তরঙ্গ উঠিল, আবার পড়িয়া মিলাইয়া গেল, যেন গলিয়া বিলীন হইল। আবার এই-সব বৈচিত্র্য লইয়া উঠিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে আবার চলিয়া গেল। এইভাবে পর পর ওঠা-নামা চলিতে থাকে। জড়পদার্থ ও শক্তির মিলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও রচিত হইয়াছে; সংস্কৃতশাস্ত্রাভিজ্ঞ দার্শনিকেরা বলেনঃ কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহারা এই মূল পদার্থের নাম দিয়াছেন 'আকাশ' (ইথার); আর প্রকৃতির যে-সব শক্তি আমরা দেখিতে পাই, সেগুলিও যে মূল শক্তির অভিব্যক্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'প্রাণ'। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্যের ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের অন্তে—অর্থাৎ কল্পান্তে—একটি সৃষ্টির বিরতি-সময় আসে। একটি সৃষ্টিপ্রবাহের পর কিছুক্ষণ বিরতি আসিয়া থাকে—সব কাজেই এই নিয়ম। যখন প্রলয়কাল আসে, তখন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকারাজি প্রভৃতির সহিত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতে হইতে আবার আকাশে পরিণত হয়; সব-কিছুই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া 'আকাশ'-এ লীন হয়। মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, গতি, চিন্তা প্রভৃতি শরীরের ও মনের যাবতীয় শক্তিও বিকীর্ণ হইতে হইতে আবার মূল 'প্রাণ'-এ লীন হইয়া যায়। ইহা হইতে আমরা প্রাণায়ামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই আকাশ যেমন সর্বত্রই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং আমরা তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছি, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান সব-কিছুই আকাশ হইতে সৃষ্ট; হ্রদের জলে ভাসমান বরফের টুকরার মত আমরাও এই ইথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। বরফের টুকরাগুলি হ্রদের জল দিয়াই গঠিত, আবার সেই জলেই ভাসিয়া বেড়ায়। বিশ্বের সমুদয় পদার্থও তেমনি 'আকাশ' দিয়া গঠিত এবং 'আকাশ'-এর সমুদ্রেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের অর্থাৎ বল ও শক্তির বিশাল সমুদ্রও ঠিক এই-ভাবেই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণসহায়েই আমাদের শ্বাস-ক্রিয়া চলে, দেহে

রক্তচলাচল হয়; এই প্রাণই স্নায়ুর ও মাংসপেশীর শক্তিরূপে এবং মস্তিষ্কের চিন্তারূপে প্রকাশ পায়। সব শক্তিই যেমন একই প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তেমনি সব পদার্থই একই আকাশের বিবিধ অভিব্যক্তি; স্থূলের কারণ সব সময়েই সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোন রসায়নবিদ্ যখন একখণ্ড স্থূল মিশ্রপদার্থ লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে থাকেন, তখন তিনি বস্তুতঃ এই স্থূল পদার্থটির উপাদান সূক্ষ্ম পদার্থের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হন। আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের বেলাও ঠিক একই কথা; স্থূলের ব্যাখ্যা সূক্ষ্মের মধ্যে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল তাহার কার্য। যে স্থূল বিশ্বকে আমরা দেখি, অনুভব করি, স্পর্শ করি, তাহার কারণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতে চিন্তার মধ্যে। চিন্তার কারণ ও ব্যাখ্যা আবার পাওয়া যায় আরও পরে। আমাদের এই মনুষ্যদেহেও হাত নাড়া, কথা বলা প্রভৃতি স্থূল কার্যগুলিই আগে আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু এই কার্যগুলির কারণ কোথায়? দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্নায়ুগুলিই তাহার কারণ; সে স্নায়ুর ক্রিয়া মোটেই আমাদের অনুভবে আসে না; তাহা এত সূক্ষ্ম যে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাহিরে। তবু আমরা জানি যে, দেহের এইসব স্থূল কার্যের কারণ এই স্নায়ুরই ক্রিয়া। এই স্নায়ুর গতিবিধি আবার সেই-সব সূক্ষ্মতর স্পন্দনের কার্য, যাহাকে আমরা চিন্তা বলিয়া থাকি। চিন্তার কারণ আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর একটি বস্তু, যাহাকে আত্মা—মানুষের চরম সত্তা অথবা জীবাত্মা বলে। নিজেকে ঠিকমত জানিতে হইলে আগে স্বীয় অনুভবশক্তিকে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কোন অণুবীক্ষণযন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলিকে দেখা যায়। এই-জাতীয় উপায় অবলম্বনে কখনও সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। তাই যোগী এমন একটি বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী যন্ত্র গঠন করিয়া দেয়; সে যন্ত্রটি মনের মধ্যেই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিষ ধরিবার মত এমন শক্তি মন পায়, যাহা কোন যন্ত্রের দ্বারা কোনকালে পাওয়া সম্ভব নয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে স্থূল হইতে শুরু করিতে হইবে। শক্তি যত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর হইয়া আসিবে, ততই আমরা নিজ প্রকৃতির গভীরতর—গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ

করিব। প্রথমে আমরা সমস্ত স্থূল ক্রিয়াগুলি ধরিতে পারিব, তারপর চিন্তার সূক্ষ্ম গতিবিধিগুলি; চিন্তা উদিত হইবার পূর্বেই তাহার সন্ধান পাইব, উহার গতি কোন্ দিকে এবং কোথায় তাহার শেষ, সব-কিছুই ধরিতে পারিব। যেমন ধর, সাধারণ মনে একটি চিন্তা উঠিল। মন জানে না—চিন্তাটি উৎপন্ন হইল কিভাবে বা কোথায়। মন যেন সমুদ্রের মত এক তরঙ্গের উৎস। কিন্তু তরঙ্গটি দেখিতে পাইলেও মানুষ বুঝিতে পারে না—কি করিয়া উহা হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, কোথায় তাহার জন্ম, কোথায় বা তাহার বিলয়। তরঙ্গটি দেখা ছাড়া বেশী আর কিছুর সন্ধান সে জানে না। কিন্তু অনুভব-শক্তি যখন সূক্ষ্ম হইয়া আসে, তখন উপরের স্তরে উঠিয়া আসার বহু পূর্বেই তরঙ্গটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি; আবার তরঙ্গটি অদৃশ্য হইবার পরও বহুদূর পর্যন্ত উহার গতিপথের অনুসরণ করিতে পারি। তখনই যথার্থ মনস্তত্ত্ব বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা বোধগম্য হয়। লোকে আজকাল নানা বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিতেছে; কিন্তু এ-সব গ্রন্থ মানুষকে শুধু ভুল পথে পরিচালিত করে। কারণ নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিবার মত ক্ষমতা না থাকায় গ্রন্থ-রচয়িতারা যে-সব বিষয় সম্বন্ধে কখনও স্বয়ং কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই, অনুমানমাত্র-সহায়ে সেই-সব বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানমাত্রকেই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সে তথ্যগুলিরও পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ অবশ্য প্রয়োজন। সামান্যীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ তথ্য যতক্ষণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ করিবার আর থাকেই বা কি? কাজেই সাধারণ তত্ত্বে পৌঁছাইবার সব প্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে—যে বিষয়গুলির আমরা সামান্যীকরণ করিতে চাই, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার উপর। একজন একটি কল্পিত মত গড়িয়া তুলিল, তারপর সেই মতকে ভিত্তি করিয়া অনুমানের পর অনুমান চলিতে লাগিল; শেষে সমগ্র গ্রন্থটি শুধু অনুমানে ভরিয়া গেল, যাহার কোনটিরই কোন অর্থ হয় না। রাজযোগ-বিজ্ঞান বলে, সর্বপ্রথম নিজের মন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তোমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে; নিজের মন বিশ্লেষণ করিয়া, মনের সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া মনের ভিতর কি ঘটিতেছে, নিজে তাহা দেখিয়া এ-কাজ করা যায়; তথ্যগুলি সংগৃহীত হইবার পর সেগুলি সামান্যীকরণ কর। তাহা হইলেই যথার্থ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান আয়ত্ত হইবে। আগেই বলিয়াছি,

কোন সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষে পৌঁছাইতে হইলে প্রথম তাহার স্থূল অংশের সাহায্য লইতে হইবে। বাহিরে যাহা কর্মপ্রবাহের আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই সেই স্থূলতর অংশ। সেটিকে ধরিয়া যদি আমরা ক্রমে আরও অগ্রসর হই, তাহা হইলে ক্রমে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে অবশেষে উহা সূক্ষ্মতম হইয়া যাইবে। এইরূপে স্থির হয়, আমাদের এই শরীর বা তাহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র বস্তু নহে; বস্তুতঃ উহারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্যন্ত বিস্তৃত একই শৃঙ্খলের পরস্পর-সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রন্থি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সবগুলিকে লইয়া তুমি একটি গোটা মানুষ; এই দেহটি অন্তরের একটি বাহ্য অভিব্যক্তি বা একটি কঠিন আবরণ; বহির্ভাগটি স্থূলতর, অন্তর্ভাগটি সূক্ষ্মতর; এমনি ভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে আত্মার কাছে গিয়া পৌঁছিবে। এভাবে আত্মার সন্ধান পাইলে তখন বোঝা যায়, এই আত্মাই সব-কিছু অভিব্যক্ত করিতেছেন; এই আত্মাই মন হইয়াছেন, শরীর হইয়াছেন; আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থূলাকারে অভিব্যক্তি মাত্র। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম স্পন্দন, যাহাকে 'ঈশ্বরেচ্ছা' বলা যায়। তাহারও পশ্চাতে আমরা এক অখণ্ড পরমাত্মার সন্ধান পাই এবং তখনই বুঝিতে পারি, সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং ইহাও অনুভূত হয় যে, জগৎ ঈশ্বর এবং পরমাত্মা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন; ফলতঃ তাহারা একটি মৌলিক সত্তারই বিভিন্ন অভিব্যক্ত অবস্থা। প্রাণায়ামের ফলেই এ-সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে এই যে-সব সূক্ষ্ম স্পন্দন চলিতেছে, তাহারা শ্বাস-ক্রিয়ার সহিত জড়িত। এই শ্বাস-ক্রিয়াকে যদি আমরা আয়ত্তে আনিতে পারি, এবং তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর গতিগুলিকেও ধরিতে পারিব, এবং এইরূপে এই শ্বাস-ক্রিয়াকে ধরিয়াই মনোরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিব।

পূর্বপাঠে তোমাদের যে প্রাথমিক শ্বাস-ক্রিয়া শিখাইয়াছিলাম, তাহা একটি সাময়িক অভ্যাস মাত্র। এই শ্বাস-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি আবার খুব কঠিন;

আমি অবশ্য কঠিন উপায়গুলি বাদ দিয়া বলিবার চেষ্টা করিব, কারণ কঠিনতর সাধনগুলির জন্য আহার ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকখানি সংযমের প্রয়োজন, আর তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই তাহা সম্ভব নয়। কাজেই সহজ ও মন্থরতর সাধনগুলি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। এই শ্বাস-ক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথম অঙ্গ হইতেছে নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, যাহার সংস্কৃত নাম 'পূরক' বা পূর্ণকরণ; দ্বিতীয় অঙ্গের নাম 'কুম্ভক' বা ধারণ, অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র বায়ুপূর্ণ করিয়া ঐ বায়ু বাহির হইতে না দেওয়া; তৃতীয় অঙ্গের নাম 'রেচক' অর্থৎ শ্বাসত্যাগ। যে প্রথম সাধনটি আজ আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই, তাহা হইতেছে সহজভাবে শ্বাস টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ দম বন্ধ রাখিয়া পরে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করা। তারপর প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর ধাপ আছে, কিন্তু আজ আর সে-বিষয়ে কিছু বলিব না; কারণ তাহার সব কথা তোমরা মনে রাখিতে পারিবে না; উহা বড়ই জটিল। শ্বাস-ক্রিয়ার এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়া একটি 'প্রাণায়াম' হয়। এই শ্বাস-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহার অভ্যাসে বিপদ আছে। সেজন্য সংখ্যার সাহায্যে ইহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়; তোমাদিগকে সর্বনিম্ন সংখ্যা লইয়াই আরম্ভ করিতে বলিব। চার সেকেণ্ড ধরিয়া শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর আট সেকেণ্ড দম বন্ধ করিয়া রাখ; পরে আবার চার সেকেণ্ড ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা পরিত্যাগ কর। * আবার প্রথম হইতে শুরু কর; এইভাবে সকালে চারিবার ও সন্ধ্যায় চারিবার করিয়া অভ্যাস করিবে। আর একটি কথা আছে। এক-দুই-তিন বা এই ধরনের অর্থহীন সংখ্যা গণনা অপেক্ষা নিজের কাছে পবিত্র বলিয়া মনে হয়, এমন কোন শব্দ জপের সহিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। যেমন আমাদের দেশে 'ওঁ' নামক একটি সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। 'ওঁ' ঈশ্বরের প্রতীক। এক, দুই, তিন, চার এই-সব সংখ্যার পরিবর্তে 'ওঁ' জপ করিলে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ হয়। আর একটি কথা। প্রথমে বাম নাক দিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া ডান নাক দিয়া উহা ছাড়িতে হইবে, পরে ডান নাক দিয়া টানিয়া বাম নাক দিয়া ছাড়িতে হইবে। তারপর আবার পদ্ধতিটি পাল্টাইয়া লও; এইভাবে পরপর চল। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে খুশীমত শুধু ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে যে-কোন নাক দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া করিবার শক্তির অধিকারী হইতে পার। কিছুদিন পর ইহা সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মুশকিল এই

যে, এখনই তোমাদের সে শক্তি নাই। কাজেই এক নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার সময় অপর নাকটি আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কুম্ভকের সময় উভয় নাসারন্ধ্রই এইভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

পূর্বে যে দুইটি বিষয় শিখাইয়াছি, উহাও ভুলিলে চলিবে না। প্রথম কথা, দেহ সোজা রাখিবে; দ্বিতীয় কথা, ভাবিবে যে তোমার শরীর দৃঢ় এবং অটুট—সুস্থ ও সবল। তারপর চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ ছড়াইয়া দিবে, ভাবিবে সারা জগৎ আনন্দে ভরপুর। পরে—যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনা করিবে। তারপর প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে। তোমাদের অনেকেরই মধ্যে হয়তো সর্বাঙ্গে কম্পন, অযথা ভয়জনিত স্নায়বিক অস্থিরতা প্রভৃতি শারীরিক বিকার উপস্থিত হইবে। কাহারও বা কান্না পাইবে, কখনও কখনও মানসিক আবেগোচ্ছ্বাস হইবে। কিন্তু ভয় পাইও না; সাধনাবস্থায় এ-সব আসিয়াই থাকে। কারণ গোটা শরীরটিকে যেন নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। চিন্তার প্রবাহের জন্য মস্তিষ্কে নূতন প্রণালী নির্মিত হইবে, যে-সব স্নায়ু সারা জীবনে কখনও কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহু পরিবর্তন-পরম্পরা উপস্থিত হইবে।

৮. ধ্যান

[স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খ্রীঃ ৩ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা—আইডা আনসেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কিছু কথা ধরিতে পারেন নাই, সে-সব স্থলে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ... দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যেকার শব্দ বা বাক্য স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকায় ১১২তম সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫) মুদ্রিত হইয়াছে।]

সকল ধর্মই 'ধ্যান'-এর উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। যোগীরা বলেন ধ্যানমগ্ন অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তু অনুশীলনে রত থাকে, তখন ইহা সেই বস্তুর সহিত একীভূত হয় এবং নিজেকে হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মানুষের মন যেন একখণ্ড স্ফটিকের মত—নিকটে যাহাই থাকুক, উহা তাহারই রঙ ধারণ করে। অন্তঃকরণ যাহাই স্পর্শ করে, ... তাহারই রঙে উহাকে রঞ্জিত হইতে হয়। ইহাই তো সমস্যা। ইহারই নাম বন্ধন। ঐ রঙ এত তীব্র যে, স্ফটিক নিজেকে বিস্মৃত হইয়া বাহিরের রঙের সহিত একীভূত হয়। মনে কর—একটি স্ফটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে; স্ফটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে লাল রঙের বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। আমাদেরও অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। (এই ভ্রান্তির) অনুগামী সব দুঃখই সেই এক অচেতন শরীর হইতে উদ্ভূত। আমাদের সব ভয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ সেই একমাত্র মহাভ্রান্তি—'আমরা শরীর' এই ভাব হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্নিহিত পুষ্পের বর্ণানুরঞ্জিত স্ফটিকতুল্য এই জীব! কিন্তু স্ফটিক যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও তেমনি শরীর নই। ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ

করিতে করিতে স্ফটিক নিজের স্বরূপ জানিতে পারে এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয়। অন্য কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে সত্যের অধিকতর নিকটে লইয়া যায়। ...

ভারতে দুই ব্যক্তির দেখা হইলে (আজকাল) তাঁহারা ইংরেজীতে বলেন, 'কেমন আছেন?' কিন্তু ভারতীয় অভিবাদন হইল, 'আপনি কি সুস্থ?' যে মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে, তোমার দুঃখ আসিবার আশঙ্কা আছে। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুঝি—আত্মার উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা। আত্মা যখন নিজের অনুধ্যানে ব্যাপৃত এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার তখনকার অবস্থাটিই নিশ্চিতরূপে সুস্থতম অবস্থা। ভাবোন্মাদনা, প্রার্থনা প্রভৃতি অপরাপর যে-সব প্রণালী আমাদের রহিয়াছে, সেগুলিরও চরম লক্ষ্য ঐ একই। গভীর আবেগের সময়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। যদিও এ আবেগটি হয়তো কোন বহির্বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মন সেখানে ধ্যানস্থ।

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বলা হয় (ধারণা)—একটি বস্তুর উপরে, একাগ্রতা অভ্যাস। এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সকল বিষয় মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া শুধু ইহারই উপর মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু মন চঞ্চল। ... মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত চঞ্চল নয়, তখনই ঐ অবস্থাকে 'ধ্যান' বলা হয়। আবার ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছে, যখন গ্লাসটি ও আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্ময়তা)। তখন মন ও গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। তখন সকল ইন্দ্রিয় কর্মবিরত হয় এবং যে-সকল শক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়)। তখন গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আসিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যোগিগণের অনুষ্ঠিত ইহা একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা। ... ধরা যাক—বাহিরের বস্তু বলিয়া কিছু আছে। সে ক্ষেত্রে যাহা বাস্তবিকই আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহা—আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা নয়। যে গ্লাসটি

আমাদের চোখে ভাসিতেছে, সেটি নিশ্চয়ই আসল বহির্বস্তু নয়। গ্লাস বলিয়া অভিহিত বাহিরের আসল বস্তুটিকে আমি জানি না এবং কখনও জানিতে পারিব না।

কোন কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; তৎক্ষণাৎ আমি আমার প্রতিক্রিয়া জিনিষটির দিকে পাঠাইলাম এবং এই উভয়ের সংযোগের ফল হইল ‘গ্লাস’। বাহিরের দিক্ হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া—‘ক’ এবং ভিতর হইতে উত্থিত প্রতিক্রিয়া—‘খ’। গ্লাসটি হইল ‘ক-খ’। যখন ‘ক’-এর দিকে তাকাইতেছ, তখন উহাকে বলিতে পার ‘বহির্জগৎ’, আর যখন ‘খ’-এর দিকে দৃষ্টি দাও, তখন উহা ‘অন্তর্জগৎ’ । ... কোন্‌টি তোমার মন আর কোন্‌টি বাহিরের জগৎ—এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে, এরূপ কোন প্রভেদ নাই। জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কিছুর সমবায় ...।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তুমি একটি হ্রদের শান্ত বুকে কতকগুলি পাথর ছুঁড়িলে। প্রতিটি প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই দেখা যায় একটি প্রতিক্রিয়া। প্রস্তরখণ্ডটিকে বেড়িয়া সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। এইরূপেই বহির্জগতের বস্তুনিচয় যেন মন-রূপ সরোবরে উপলরাশির মত নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জিনিষ দেখি না ...; দেখি শুধু তরঙ্গ ...।

মনে উত্থিত তরঙ্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। আমরা আদর্শবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) গুণ-সকল আলোচনা করিতেছি না। মানিয়া লইতেছি—বাহিরের জিনিষ রহিয়াছে, কিন্তু যাহা আমরা দেখি, তাহা বাহিরে অবস্থিত বস্তু হইতে ভিন্ন, কেন-না আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বহিঃস্থ বস্তু ও আমাদের নিজেদের সত্তার একটি সমবায়।

মনে কর—আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা গ্লাসটি হইতে উঠাইয়া লইলাম। কি অবশিষ্ট রহিল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে। যদি আমি আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা এই টেবিলটি হইতে সরাইয়া লই, টেবিলের আর কি থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না, কারণ ইহা উৎপন্ন হইয়াছিল বহির্বস্তু ও আমার ভিতর হইতে প্রদত্ত কিছু—

এই দুই লইয়া। (প্রস্তরখণ্ড) যখনই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, হ্রদ বেচারীকে তখনই উহার চারিপাশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে। যে-কোন উত্তেজনার জন্য মনকে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেই হইবে। মনে কর ... আমরা যেন মন বশীভূত করিতে পারি। তৎক্ষণাৎ আমরা মনের প্রভু হইব। আমরা বাহিরের ঘটনাগুলিকে আমাদের যাহা কিছু দেয়, তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম ...। আমি যদি আমার ভাগ না দিই, বাহিরের ঘটনা থামিতে বাধ্য। অনবরত তুমি এই বন্ধন সৃষ্টি করিতেছ। কিরূপে? তোমার নিজের অংশ দিয়া। আমরা সকলেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া বন্ধন রচনা করিতেছি...। যখন বহির্বস্তু ও আমার মধ্যে অভিন্ন বোধ করার ভাব চলিয়া যাইবে, তখন আমি আমার (দেয়) ভাগটি তুলিয়া লইতে পারিব এবং বস্তুও বিলুপ্ত হইবে। তখন আমি বলিব, 'এখানে এই গ্লাসটি রহিয়াছে,' আর আমি আমার মনটি উহা হইতে উঠাইয়া লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটিও অদৃশ্য হইবে ...। যদি তুমি তোমার দেয় অংশ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হও, তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে পারিবে। জল আর তোমাকে ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকার কষ্টও থাকিবে না। প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুতে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ। যদি তোমার অর্ধভাগ সরাইয়া লওয়া যায় তো দৃশ্যমান বস্তুর বিলুপ্তি ঘটিবে।

... প্রত্যেক কাজেরই সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে ...। যদি কোন লোক আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয়—ইহা সেই লোকটির কার্য এবং (বেদনা) আমার শরীরের প্রতিক্রিয়া ...। মনে কর আমার শরীরের উপর আমার এতটা ক্ষমতা আছে যে, আমি ঐ স্বয়ংচালিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। ঐরূপ শক্তি কি অর্জন করা যায়? ধর্মশাস্ত্র (যোগশাস্ত্র) বলে, যায় ...। যদি তুমি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ইহা লাভ কর, তখন বলিয়া থাক—'অলৌকিক' ঘটনা। আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা কর, তখন উহার নাম 'যোগ' ।

মানসিক শক্তির দ্বারা লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিয়াছি। উহা 'অলৌকিক কর্মী'র কাজ। আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন,

'না, মোটেই না, ইহা কেবল তাঁহার মনের শক্তির ফল। লোকটি বৈজ্ঞানিক। তিনি জানেন, তিনি কি করিতেছেন।'

ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে পারে। যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, (ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের সকল আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সব-কিছু ভুলিয়া যান—এমন কি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, আর তখন মহান্ সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মত আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিঃশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তুক নয় (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই বৃথা পাওয়া যায় নাই।

যীশুখ্রীষ্টের কার্যের মধ্যে আমরা তথাকথিত শ্রেষ্ঠ 'অনুপ্রেরণা' দেখিতে পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অনুপ্রেরণা' তাঁহার প্রাক্তন কর্মের—কঠিন শ্রমের ফল ...। 'অনুপ্রেরণা' লইয়া ঢাক পিটান অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে ইহা বর্ষাধারার মত পতিত হইত। যে-কোন চিন্তাধারায় প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ শিক্ষিত (ও কৃষ্টিসম্পন্ন) জাতিসমূহের মধ্যেই আবির্ভূত হন। প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই। ... অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়—যে সংস্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, সেগুলির কার্যপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আসে এই ফল! তাঁহাদের অতীত কর্মই ইহার কারণ।

সেখানেও দেখিবে ধ্যানের শক্তি—চিন্তার গভীরতা। ইঁহারা নিজ নিজ আত্মাকে মন্থন করেন। মহান্ সত্যসমূহ উপরিভাগে আসিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। ধ্যানের শক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ধ্যানশক্তির প্রয়োগে অজ্ঞান, কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে আমরা সাময়িকভাবে মুক্ত হইতে পারি, ইহার বেশী নয়। মনে কর, এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে যে, এই বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে এবং আর এক ব্যক্তি রাত্রে আসিয়া বলিল, 'যাও, বিষ পান কর!' এবং বিষ খাইয়াও আমার মৃত্যু হইল না (যাহা ঘটিল তাহা এই)—ধ্যানের ফলে বিষ ও আমার নিজের মধ্যে

একত্ববোধ হইতে সাময়িকভাবে আমার মন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অপর পক্ষে সাধারণভাবে বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে ধ্যানের অবস্থায় উন্নীত করি, তবে যে-কোন লোককেই আমি বাঁচাইতে পারি। এই কথা (যোগ)-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইহা কতখানি নির্ভুল, তাহার বিচার তোমরাই করিও।

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমরা ভারতবাসীরা এ-সব জয় কর না কেন? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তোমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা দাবী কর। তোমরা যোগাভ্যাস কর এবং অন্য কাহারও অপেক্ষা দ্রুত অভ্যাস কর। তোমরা যোগ্যতর। ইহা কার্যে পরিণত কর! তোমরা যদি মহান্ জাতি হইয়া থাক, তোমাদের যোগপদ্ধতিও মহান্ হওয়া উচিত। সব দেবতাকে বিদায় দিতে হইবে। বড় বড় দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের ঘুমাইতে দাও। তোমরাও বিশ্বের অন্য সকলের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিশু মাত্র। তোমাদের সব কিছু দাবী নিষ্ফল। তোমাদের যদি সত্যি দাবী থাকে, সাহসের সহিত দাঁড়াও, এবং স্বর্গ বলিতে যাহা কিছু—সব তোমাদের। কস্তুরীমৃগ তাহার অন্তর্নিহিত সৌরভ লইয়া আছে, এবং সে জানে না—কোথা হইতে সৌরভ আসিতেছে। বহুদিন পর সে সেই সৌরভ নিজের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। এ-সব দেবতা ও অসুর মানুষের মধ্যে আছে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিতে জান যে, তোমার মধ্যেই সব আছে। দেবতা ও কুসংস্কারের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা যুক্তিবাদী, যোগী, যথার্থ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন হইতে চাও।

(আমার উত্তর এইঃ তোমাদের নিকট) সব-কিছুই জড়। সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বর অপেক্ষা বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মূর্তিপূজক গরীব বেচারীকে তো তোমরা ঘৃণা করিতেছ। তার চেয়ে তোমরা বড় নও। আর ধনের পূজারী তোমরাই বা কী! মূর্তিপূজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত কোন বিশেষ কিছুকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা তো সেটুকুও কর না। আত্মার অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন কিছুর উপাসনা তোমরা কর না! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। 'ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ!' ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপই। প্রকৃত ভাব ও বিশ্বাস লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। চৈতন্য কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে?

'আমাদের ঈশ্বর'—এই কথার অর্থ কি? তুমিই তো চৈতন্য। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই ত্যাগ করিও না। আমি চৈতন্যস্বরূপ। যোগের সমস্ত কৌশল এবং ধ্যানপ্রণালী আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য।

এখনই কেন এই সমস্ত বলিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি (ঈশ্বরের) স্থান নির্দেশ করিতে পারিবে, এ-বিষয় কিছুই বলিতে পার না। (তাঁহার) প্রকৃত স্থান ব্যতীত স্বর্গে এবং মর্ত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছ। আমি চেতন প্রাণী, অতএব সমস্ত চেতনার সারভূত চেতনা আমার আত্মাতে অবশ্যই থাকিবে। যাহারা ভাবে ঐ চেতনা অন্য কোথাও আছে, তাহারা মূর্খ। অতএব আমার চেতনাকে এই স্বর্গেই অন্বেষণ করিতে হইবে। অনাদিকাল হইতে যেখানে যত স্বর্গ আছে, সে-সব আমারই মধ্যে। এমন অনেক যোগী ঋষি আছেন, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া 'আবৃত্তচক্ষু' হন এবং নিজেদের আত্মার সমস্ত চেতনার চেতনাকে দর্শন করেন। ইহাই ধ্যানের পরিধি। ঈশ্বর ও তোমার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার কর এবং এইরূপে মুক্ত হও।

সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়া চলিয়াছে, শেষে আমরা দেখি—ইহা মূর্খতামাত্র। জীবন অপেক্ষা আরও মহত্তর কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক (এই জীবন) নিকৃষ্টতর। কেন আমি বাঁচিবার আশায় ছুটিতে যাইব? জীবন অপেক্ষা আমার স্থান যে অনেক উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই সর্বদা দাসত্ব। আমরা সর্বদাই (অজ্ঞানের সহিত নিজেদের) মিশাইয়া ফেলিতেছি ...। সবই দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল।

তুমি যে কিছু লাভ কর, সে কেবল নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া (আমরা শিক্ষা করি) ... ঐ যে যুবকটি—উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে, জীবনে বিপদ-আপদ আছে। আবার বৃদ্ধকে বুঝাইতে পারিবে না যে, জীবন বিপত্তিহীন, মসৃণ। বৃদ্ধ অনেক দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহাই পার্থক্য।

ধ্যানের শক্তিদ্বারা এ-সবই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে। আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে, আত্মা মন ভূত (জড় পদার্থ) প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের (বাস্তব সত্তা কিছু নাই)। ... যাহা আছে, তাহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। বহু কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। অজ্ঞানের জন্যই বহু দেখি। জ্ঞানে একত্বের উপলব্ধি ...। বহুকে একে পরিণত করাই বিজ্ঞান ...। সমগ্র বিশ্বের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের নাম বেদান্ত-বিদ্যা। সমগ্র জগৎ এক। আপাত প্রতীয়মান বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই 'এক' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের পক্ষে এখন এই-সকল বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমরা এগুলি দেখিতেছি—অর্থাৎ এগুলি আমরা বলি পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ)। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহারও পরে। আত্মা এক, মন অন্য, আকাশ অন্য একটি কিছু ইত্যাদি—এরূপ কিন্তু নয়। এই-সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একই সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে; ফিরিয়া গেলে কঠিন অবশ্যই তরলে পরিণত হইবে। যেভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, সেভাবেই আবার তাহাদের ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কঠিন পদার্থগুলি তরলাকার ধারণ করিবে, তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে। নিখিল জগতের ইহাই কল্পনা—এবং ইহা সর্বজনীন। বাহিরের এই জগৎ এবং সর্বজনীন আত্মা, মন, আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি আছে। মন সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুদ্র জগতে বা অন্তর্জগতে 'আমি' ঠিক ঐ এক। আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ। আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্তায় প্রত্যাবর্তন। একটি ক্ষুদ্র জীবনে 'মানুষকে' সমগ্র বিশ্বের জীবন যাপন করিতে হইবে। এরূপে মানুষ এ-জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেই সে বিশ্বজীবন অতিবাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

আমরা সকলেই সংগ্রাম করি। ... যদি আমরা পরম সত্যে পৌঁছিতে না পারি, তবে অন্ততঃ এমন স্থানেও উপনীত হইব, যেখানে এখানকার অপেক্ষা উন্নততর অবস্থাতেই থাকিব। এই অভ্যাসেরই নাম ধ্যান। (সব কিছুকে সেই চরম সত্য—আত্মাতে পর্যবসিত

করা।) কঠিন দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাষ্পে, বাষ্প ব্যোম্ বা আকাশে আর আকাশ মনে রূপান্তরিত হয়। তারপর মনও গলিয়া যাইবে। শুধু থাকিবে আত্মা—সবই আত্মা।

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবী করেন যে, এই শরীর তরল বাষ্প ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। তুমি শরীর দ্বারা যাহা খুশী করিতে পারিবে—ইহাকে ছোট করিতে পার, এমন কি বাষ্পেও পরিণত করিতে পার, এই দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাতায়াতও সম্ভব হইতে পারে—এই রকম তাঁহারা দাবী করেন। আমার অবশ্য তাহা জানা নাই। আমি কখনও কাহাকেও এরূপ করিতে দেখি নাই। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই-সব কথা আছে। যোগশাস্ত্রগুলিকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জীবনে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহা প্রতিভাত হয়। কে জানে এখানেই হয়তো কোন প্রাচীন যোগী রহিয়াছেন, যাঁহার মধ্যে সাধনা সম্পূর্ণ করিবার সামান্যই একটু বাকী। অভ্যাস!

একটি চিন্তাধারার মাধ্যমে ধ্যানে পৌঁছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্ধীকরণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—এক-একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া স্থূল হইতে পরবর্তী সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে, তাহাও আবার মনে, মনকে পরিশেষে আত্মায় মিশাইয়া দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ।*

জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ। অবশ্য জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আধার, প্রায় সর্বশক্তিমান্, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্ হইতে পারেন না। যদি কোন মুক্ত পুরুষ বলেন, 'আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ইহাকে এই পথ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য করিব' এবং আর একজন মুক্তাত্মা যদি বলেন, 'আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, ঐ পথে চালাইব' (তবে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হইবে)।

তোমরা যেন এই ভুল করিও না। আমি যে ইংরেজীতে বলি, ‘আমি ঈশ্বর (God)’, তাহার কারণ ইহা অপেক্ষা আর কোন যোগ্যতর শব্দ নাই। সংস্কৃতে ‘ঈশ্বর’ মানে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান–স্বয়ংপ্রকাশ অনন্ত চৈতন্য। ঈশ্বর অর্থে কোন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূমা। ...

আমি কখনও রাম নই, ঈশ্বরের (ঈশ্বরের সাকার ভাবের) সহিত কখনও এক নই, কিন্তু আমি (ব্রহ্মের সহিত–নৈর্ব্যক্তিক সর্বত্র-বিরাজমান সত্তার সহিত) এক। এখানে একতাল কাদা রহিয়াছে। এই কাদা দিয়া আমি একটি ছোট ইঁদুর তৈরী করিলাম আর তুমি একটি ক্ষুদ্রকায় হাতী প্রস্তুত করিলে। দুই-ই কাদার। দুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল। তাহারা মূলতঃ এক–তাই একই মৃত্তিকায় পরিণত হইল। ‘আমি এবং আমার পিতা এক।’ (কিন্তু মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতী কখনই এক হইতে পারে না।)

কোন জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া যাও। আবার এক আত্মা আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই ঈশ্বর, যোগাধীশ (স্রষ্টারূপে সগুণ ঈশ্বর)। তখন তিনি সর্বশক্তিমান্ ‘ব্যক্তি’। সকল জীবের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। তাঁহার শরীর নাই–শরীরের প্রয়োজন হয় না। ধ্যানের অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পার, যোগীন্দ্র ঈশ্বরের ধ্যান করিয়াও তাহা লভ্য। একই বস্তু আবার কোন মহাপুরুষকে, অথবা জীবনের ঐকতানকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যায়। এগুলিকে বিষয়গত ধ্যান বলে। সুতরাং এইভাবে কয়েকটি বাহ্য বা বিষয়গত বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুগুলি বাহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে। যদি তুমি একটি দীর্ঘ বাক্য গ্রহণ কর, তবে তাহা মোটেই ধ্যান করিতে পারিবে না। ধ্যান মানে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া মনকে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করার চেষ্টা। মন সকল চিন্তাতরঙ্গ থামাইয়া দেয় এবং জগৎও থাকে না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারেই ধ্যানের দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। ... আরও একটু বেশী কঠোর পরিশ্রম কর–ধ্যান গভীরতর হইবে। তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর বোধ থাকিবে না। এইভাবে একঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে তোমার মনে হইবে

যে, ঐ সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই তোমার শরীরযন্ত্রটিকে বিশ্রাম দিবার একমাত্র উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও ঐরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না। গভীরতম নিদ্রাতেও মন লাফাইতে থাকে। কিন্তু (ধ্যানের) ঐ কয়েকটি মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে। শরীরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই আনন্দ পাইবে যে, তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ করিবে। ধ্যানে আমরা এইরূপ পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকি।

তারপর বিভিন্ন বস্তুর উপরে ধ্যান। মেরুমজ্জার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যানের প্রণালী আছে। (যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ এই দুই প্রধান পথে গমনাগমন করে।) শূন্যনালী (যাহাকে বলে সুষুম্না) মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্না-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উন্মুক্ত হয়, (স্নায়বীয়) প্রাণশক্তিপ্রবাহকে (মেরুদণ্ডের নীচে) চালাইয়া দিতে পারিলেই কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। জগৎ তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে। ... (এইরূপে ঐশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।)

সহস্র সহস্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ তোমার জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেই 'ক'-কে দেখি বা উপলব্ধি করি। বাহিরে অবস্থিত ঐ গাছটিকে ধরা যাক। একটি চোর আসিল, সে ঐ মুড়া গাছটিকে কি ভাবিবে? সে দেখিবে—একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে। শিশু উহাকে মনে করিল—একটা প্রকাণ্ড ভূত। একটি যুবক তাহার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে কি দেখিল? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে। কিন্তু এই স্থাণু বা মুড়া গাছটির তো কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল

আছেন, আমরাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে মানুষ, ধূলি, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি-রূপে দেখিয়া থাকি।

যাহারা একইভাবে গঠিত, তাহারা স্বভাবতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—তোমরা একই স্থানে বাস কর। সমস্ত স্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কতকগুলি বড় বৃত্তের আকারে সমতল ক্ষেত্রসমূহ যেন পরস্পর কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে … । এই সমতল ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত আমরা আর একটি সমতলের (বৃত্তকে) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে পারি। মন যদি কেন্দ্রে পৌঁছে, তবে সমস্ত স্তরেরই তোমার জ্ঞান হইতে থাকিবে। ধ্যানের সময় কখনও কখনও তুমি যদি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্য জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা এবং আরও কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে পার।

ধ্যানের শক্তি দ্বারাই এই-সব লোকে যাইতে পার। এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে। যদি তুমি পাঁচদিন ঠিক ঠিক ধ্যান অভ্যাস কর, এই (জ্ঞান) কেন্দ্রগুলির ভিতর হইতে একপ্রকার 'সংবেদনা' অনুভব করিবে—তোমার শ্রবণশক্তি সূক্ষ্মতর হইতেছে। … (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যতই মার্জিত হইবে, অনুভূতিও ততই সূক্ষ্ম হইবে। তখন অধ্যাত্মজগৎ খুলিয়া যাইবে।) এইজন্য ভারতীয় দেবতাগণের তিনটি চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে। তৃতীয় বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বিবিধ আধ্যাত্মিক দর্শন উপস্থিত হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে যতই উঠিতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগৎ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন স্বর্গে পরিণত হয়। তোমার কথা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর কুণ্ডলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নামিলে তুমি আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়া পড়। সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে সহস্রারে পৌঁছিবে, তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ (তোমার অনুভূতিতে) বিলীন হয় এবং এক সত্তা ব্যতীত কিছুই অনুভব কর না। তখন তুমিই

পরমাত্মা; সমুদয় স্বর্গ তাঁহা হইতেই সৃষ্টি করিতেছ; সমস্ত জগৎও তাঁহা হইতেই রচনা করিতেছ। তিনিই একমাত্র সত্তা; তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

৯. সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

[ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলেস-এ 'হোম্-অব্-ট্রুথ'-এ প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজ সকালে প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তত্ত্বের আলোচনা অনেক হইয়াছে, এখন তাহার সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিলে মন্দ হইবে না। এই বিষয়টির উপর ভারতে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। এদেশের লোক যেমন জাগতিক বিষয়ে কার্যকুশল, আমাদের দেশের লোক তেমনি ঐ বিষয়ে দক্ষ বলিয়া মনে হয়। এদেশের পাঁচজন লোক একসঙ্গে ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করে, আমরা একটি যৌথ কারবার (প্রতিষ্ঠান?) আরম্ভ করিব, আর পাঁচঘণ্টার মধ্যে তাহা করিয়াও ফেলে। ভারতের লোক কিন্তু এ-সব ব্যাপারে এত অপটু যে, তাহাদের পঞ্চাশ বছরের চেষ্টাতেও এ-কাজটি হয়তো হইয়া উঠিবে না। কিন্তু একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে; সেখানে যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করিতে চায়, তাহা হইলে সে মতবাদ যত উদ্ভটই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। যেমন ধর, একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, বার বছর দিনরাত একপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে দাঁড়াইবার মত শত শত লোক জুটিয়া যাইবে। তাহারা নীরবে সব কষ্ট সহ্য করিবে। বহু লোক আছে, যাহারা ধর্মলাভের জন্য বছরের পর বছর ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকে; আমি স্বচক্ষে এরূপ শত শত লোক দেখিয়াছি। আর এ-কথাও মনে করা চলিবে না যে, তাহারা নিরেট আহাম্মক; বস্তুতঃ তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কর্মদক্ষতা শব্দটিরও অর্থ আপেক্ষিক।

অপরের দোষ-গুণ বিচার করিবার সময় আমরা প্রায়ই এই একটি ভুল করিয়া বসি; আমাদের মনোরাজ্যে আমরা যে বিশ্ব রচনা করিতেছি, তাহার বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারে—এ কথা যেন আমরা কখনও ভাবিতেই চাই না; আমরা ভাবি—আমাদের নিজের নীতিবোধ, ঔচিত্যবোধ, কর্তব্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ ভিন্ন ঐসব ক্ষেত্রে আর সমস্ত

ধারণাই মূল্যহীন। সেদিন ইওরোপ যাত্রার পথে মার্সাই শহর হইয়া যাইতেছিলাম; তখন সেখানে ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল। উহা দেখিয়া জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা সকলেই ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে অতি নৃশংস বলিয়া সমালোচনা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া শুনিলাম, বাজী রাখিয়া লড়াই করিবার জন্য প্যারিসে একদল লোক গিয়াছিল, কিন্তু ফরাসীরা তাহাদের সদ্যসদ্য ফিরাইয়া দিয়াছে। ফরাসীদের মতে ও-কাজটি পাশবিক। বিভিন্ন দেশে এই-জাতীয় মতামত শুনিতে শুনিতে আমি যীশুখ্রীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শুরু করিয়াছি—'অপরের বিচার করিও না, তাহা হইলেই নিজেও অপরের বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।' যতই শিখি, ততই আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়ে, ততই আমরা বুঝি যে, মানুষের এই মন-নামক বস্তুটি কত বিচিত্র, কত বহুমুখী! যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, স্বদেশবাসীদের তপস্বিসুলভ কৃচ্ছ্রসাধনের সমালোচনা করা আমার অভ্যাস ছিল; আমাদের দেশের বড় বড় আচার্যেরাও উহার সমালোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মত ক্ষণজন্মা মহামানবও ঐরূপ করিয়াছেন। তবু বয়স যত বাড়িয়াছে, ততই বুঝিতেছি যে, বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। কখনও কখনও মনে হয়, বহু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই-সব তপস্বীর সাধনশক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার একাংশও যদি আমার থাকিত! প্রায়ই মনে হয়, এ-বিষয়ে আমি যে-অভিমত দিই ও সমালোচনা করি, তাহার কারণ এই নয় যে, আমি দেহ-নির্যাতন পছন্দ করি না; নিছক ভীরুতাই ইহার কারণ, কৃচ্ছ্রসাধনার শক্তি ও সাহসের অভাবই ইহার কারণ।

তাহা হইলেই দেখিতেছ যে, শক্তি, বীর্য ও সাহস—এই-সব অতি অদ্ভুত জিনিষ। 'সাহসী লোক,' 'বীর পুরুষ,' 'নির্ভীক ব্যক্তি'—প্রভৃতি কথা সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, ঐ সাহসিকতা বা বীরত্ব বা অন্য কোন গুণই ঐ লোকটির চরিত্রের চিরসাথী নয়। যে-লোক কামানের মুখে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই-ই আবার ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়; আবার অপর কেহ হয়তো কোন কালেই কামানের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস পায় না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্থিরভাবে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারে। কাজেই অপরের বিচার করিবার সময়

সাহসিকতা, মহত্ত্ব ইত্যাদি যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ খুলিয়া বলা প্রয়োজন। ‘ভাল নয়’ বলিয়া যে-লোকটির সমালোচনা আমি করিতেছি, সেই লোকটিই হয়তো আমি যে-সব বিষয়ে ভাল নই, এমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য রকমে ভাল হইতে পারে। আর একটি উদাহরণ দেখ। প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্মদক্ষতা লইয়া আলোচনাকালে আমরা সর্বদা ঠিক এই ভুলটিই করিয়া বসি। যেমন—পুরুষরা লড়াই করিতে এবং প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে বলিয়া লোকে মনে করে যে, এই বিষয় লইয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায়; আর স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের এই গুণের তুলনা করা চলে। ইহা অন্যায়। মেয়েরাও পুরুষদের মত সমান সাহসী। নিজ নিজ ভাবে প্রত্যেকেই ভাল। নারী যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ লইয়া সন্তান পালন করে, কোন্ পুরুষ সেভাবে তাহা করিতে পারে? একজন কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, অপরজন বাড়াইয়াছে সহনশক্তি। যদি বল, মেয়েরা তো শারীরিক শ্রম করিতে পারে না, তবে বলিব, পুরুষরাও তো সহ্য করিতে পারে না। সমগ্র জগৎটি একটি নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যাপার। এখন আমার জানা নাই, তবে একদিন হয়তো আমরা জানিতে পারিব যে, নগণ্য কীটের ভিতরেও এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের মানবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অতি দুষ্টপ্রকৃতির লোকের ভিতরেও এমন কিছু সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতর মোটেই নাই। নিজ জীবনে আমি প্রতিদিন ইহা লক্ষ্য করিতেছি। অসভ্য জাতির একজন লোককে দেখ না! আমার দেহটি যদি তাহার মত অমন সুঠাম হইত! সে ভরপেট খায়-দায়, অসুখ কাহাকে বলে—তাহা বোধ হয় জানেই না; আর এদিকে আমার তো অসুখ লাগিয়াই আছে। তাহার দেহের সঙ্গে আমার মস্তিষ্ক বদলাইয়া লইতে পারিলে আমার সুখের মাত্রা কতই না বাড়িয়া যাইত। তরঙ্গের উত্থান ও পতন লইয়াই গোটা জগৎটি গড়া; কোন স্থান নীচু না হইলে অপর একটি স্থান উঁচু হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করিতে পারে না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য বিদ্যমান। কোন বিষয়ে তুমি মহৎ, তোমার প্রতিবেশীর মহত্ত্ব অন্য বিষয়ে। স্ত্রী-পুরুষের বিচার করিবার সময় তাহাদের নিজ নিজ মহত্ত্বের মান ধরিয়া বিচার করিও। একজনের জুতা আর একজনের পায়ে ঢুকাইতে গেলে চলিবে কেন? একজনকে খারাপ বলিবার কোন

অধিকারই অপরের নাই। এই-জাতীয় সমালোচনা দেখিলে সেই প্রাচীন কুসংস্কারেরই কথা মনে পড়ে—'এরূপ করিলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে।' কিন্তু সেরূপ করা সত্ত্বেও জগৎ এখনও ধ্বংস হইয়া যায় নাই। এদেশে বলা হইত যে, নিগ্রোদের স্বাধীনতা দিলে দেশের সর্বনাশ হইবে; কিন্তু সর্বনাশ হইয়াছে কি? আরও বলা হইত যে, গণশিক্ষার প্রসার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু তাহাতে আসলে জগতের উন্নতিই হইয়াছে। কয়েক বছর আগে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে ইংলণ্ডের সব চেয়ে খারাপ অবস্থার সম্ভাবনার বর্ণনা ছিল। লেখক দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতেছে। একটা রব উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দাবী অত্যধিক—এদিকে জার্মানরা কত কম বেতনে কাজ করে! এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য জার্মানীতে একটি কমিশন পাঠান হইল। কমিশন ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, জার্মান শ্রমিকরা উচ্চতর হারে মজুরী পায়। এইরূপ হইল কি করিয়া? জনশিক্ষাই ইহার কারণ। কাজেই জনশিক্ষার ফলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে, এ-কথাটির গতি কি হইবে? বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আধিপত্য। তাহারা জনগণের কাছে সব কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমরাই জগতের মাথার মণি—এই-আত্মপ্রসাদকর সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে তাহারা। তাহাদের বিশ্বাস—এই-সব ভয়ঙ্কর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, তাহাতে শুধু জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এখন কর্মকুশলতার কথাতেই ফিরিয়া আসা যাক। ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই মনস্তত্ত্বের ব্যাবহারিক প্রয়োগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে ভারতে একজন বড় দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার নাম পতঞ্জলি। মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, প্রমাণ ও গবেষণা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অতীতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতার সুযোগটুকুও লইয়াছিলেন। মনে থাকে যেন, জগৎ অতি প্রাচীন; মাত্র দুই বা তিন হাজার বছর পূর্বে ইহার জন্ম হয় নাই। এখানে—পাশ্চাত্যদেশে শেখান হয় যে, 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর আগে সমাজের জন্ম হইয়াছিল; তাহার পূর্বে সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। পাশ্চাত্য-জগতের বেলা এ-কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা নয়। লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার একজন সুপণ্ডিত মেধাবী

বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক করিতেন; তাঁহার তূণীরে যত শর ছিল, তাহার সবগুলি একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করিবার পর হঠাৎ তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'তাহা হইলে আপনাদের ঋষিরা ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেন নাই কেন?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'কারণ তখন ইংলণ্ড বলিয়া কিছু ছিলই না, যে সেখানে আসিবেন। তাঁহারা কি অরণ্যে গাছপালার কাছে প্রচার করিবেন?'

ইঙ্গারসোল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হইত, আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, অথবা ঢিল ছুঁড়িয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।'

কাজেই খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, ইহা মনে করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। সভ্যতা সব সময়েই নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় আসিয়াছে কিনা—এ-কথার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই ধারণাটিকে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সব যুক্তি-প্রমাণ দেখান হইয়াছে, ঠিক সেই-সব যুক্তি-প্রমাণ দিয়া ইহাও দেখান যায় যে, সভ্য মানুষই ক্রমে অসভ্য বর্বরে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, চীনারা কখনও বিশ্বাসই করিতে পারে না যে, আদিম বর্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ তাহাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা যখন আমেরিকার সভ্যতার উল্লেখ কর, তখন তোমাদের বলিবার প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের জাতি চিরকাল থাকিবে এবং উন্নতির পথেই চলিবে। যে হিন্দুরা সাত শত বৎসর ধরিয়া অবনতির পথে চলিতেছে, তাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতায় অতি-উন্নত ছিল—এ-কথা বিশ্বাস করা খুবই সহজ। ইহা যে সত্য নয়—এ-কথা প্রমাণ করা যায় না।

কোন সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোন জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই। এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, মূল সভ্যতার অধিকারী জাতি একটি বা দুটি ছিল, তাহারাই বাহিরে যাইয়া নিজেদের

ভাব ছড়াইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; এইভাবেই সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছে।

বাস্তব জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলাই ভাল। কিন্তু একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে। ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার যেমন আছে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ কুসংস্কার আছে। এমন অনেক পুরোহিত আছেন, যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানকে নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেন; তেমনি বৈজ্ঞানিক নামধেয় এমন অনেক আছেন, যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের পূজারী। ডারউইন বা হাক্সলির মত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নাম করা মাত্র আমরা অন্ধভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করি। এইটি আজকালকার চলিত প্রথা। যাহাকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তাহার ভিতর শতকরা নিরানব্বই ভাগই হইতেছে নিছক মতবাদ। ইহাদের অনেকগুলি আবার প্রাচীনকালের বহু-মস্তক ও বহু-হস্তবিশিষ্ট ভূতে অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নয়; তবে পার্থক্য এইটুকু যে, কুসংস্কার হইলেও উহাতে মানুষকে গাছপাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে অন্ততঃ খানিকটা আলাদা বলিয়া ভাবা হইত। যথার্থ বিজ্ঞান আমাদের সাবধানে চলিতে বলে। পুরোহিতদের সঙ্গে ব্যবহারে যেমন সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও তেমনি সতর্কতা আবশ্যক। অবিশ্বাস লইয়া শুরু কর। বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, সব প্রমাণ পাইয়া তবে বিশ্বাস কর। আধুনিক বিজ্ঞানের অতিপ্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্তীর্ণ হয় নাই। অঙ্কশাস্ত্রের মত বিজ্ঞানের ভিতরেও অনেকগুলি মতবাদই শুধু কাজ চালাইয়া যাইবার উপযুক্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাতিল হইয়া যাইবে।

খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে একজন বড় ঋষি কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের সুবিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং সামান্যীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে তাঁহার আবিষ্কৃত জ্ঞানের অংশবিশেষ লইয়া তাহার বিশেষ চর্চা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে শুধু হিন্দুরাই জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির চর্চায় যথার্থ আন্তরিকতার সহিত ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি এখন বিষয়টি তোমাদের শিখাইতেছি—কিন্তু

তোমরা কয়জনই বা ইহা অভ্যাস করিবে? অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে কয়দিন বা কয়মাস আর লাগিবে তোমাদের? এ-বিষয়ের উপযুক্ত উদ্যম তোমাদের নাই। ভারতবাসীরা কিন্তু যুগের পর যুগ ইহার অনুশীলন চালাইয়া যাইবে। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, ভারতবাসীদের কোন সাধারণ প্রার্থনা-গৃহ, কোন সাধারণ সমবেত প্রার্থনা-মন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন কিছু নাই; তাহা সত্ত্বেও তাহারা প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করে, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে; এইটিই তাহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ। এইগুলিই মূল কথা। প্রত্যেক হিন্দুকে ইহা করিতেই হয়। ইহাই সে-দেশের ধর্ম। তবে সকলে এক পদ্ধতি অবলম্বনে উহা না-ও করিতে পারে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, মনঃসংযম প্রভৃতি অভ্যাস করিবার জন্য এক এক জনের এক একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকিতে পারে। কিন্তু একজনের পদ্ধতি অপরের জানিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি তাহার স্ত্রীর-ও না; পিতাও হয়তো জানেন না, পুত্র কি পদ্ধতি অবলম্বনে চলিতেছে। কিন্তু সকলকেই এ-সব অভ্যাস করিতে হয়। আর এ-সবের মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; গোপন রহস্যের কোন ভাবই ইহার মধ্যে নাই। হাজার হাজার লোক নিত্য গঙ্গাতীরে বসিয়া চোখ বুজিয়া প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা-সাধনের অভ্যাস করিতেছে—এ-দৃশ্য নিত্যই চোখে পড়ে। মানব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি অভ্যাস-সাধনার পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দুইটি অন্তরায় থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মাচার্যেরা মনে করেন যে, সাধারণ লোক এ-সব সাধনার যোগ্য নয়। এই ধারণায় হয়তো কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু গর্বের ভাবই ইহার জন্য বেশী দায়ী। দ্বিতীয় অন্তরায় নির্যাতনের ভয়। যেমন—এদেশে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে প্রকাশ্য স্থানে কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে চাহিবে না; এখানে এ-সবের চলন নাই। আবার ভারতে যদি কেহ, 'ভগবান্, আজ আমাকে দিনের অন্ন যোগাড় করিয়া দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, তবে লোকে উপহাস করিবে। হিন্দুদের দৃষ্টিতে 'হে আমার স্বর্গবাসী পিতা' ইত্যাদি বলার চেয়ে বড় আহাম্মকি থাকিতে পারে না। উপাসনাকালে হিন্দু ইহাই ভাবিয়া থাকে যে, ভগবান্ তাহার অন্তরেই রহিয়াছেন।

যোগীরা বলেন, আমাদের দেহে তিনটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ আছে; একটিকে তাঁহারা ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা, আর এই দুইটির মধ্যবর্তীটিকে বলেন সুষুম্না; এগুলি সবই

মেরু-নালীর মধ্যে অবস্থিত। বামদিকের ইড়া এবং দক্ষিণের পিঙ্গলা—এই দুইটির প্রত্যেকটিই স্নায়ু-গুচ্ছ; আর মধ্যবর্তী সুষুম্নাটি একটি শূন্য নালী, স্নায়ুগুচ্ছ নয়। এই সুষুম্না-পথ রুদ্ধাবস্থায় থাকে; সাধারণ মানুষ শুধু ইড়া ও পিঙ্গলার সাহায্যেই কাজ চালায় বলিয়া ঐ পথটি তাহাদের কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চারী অন্যান্য স্নায়ুগুলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিষ্কের আদেশ পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ সব সময়ে চলাফেরা করে। ইড়া ও পিঙ্গলাকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ করাই প্রাণায়ামের মহান্ উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই—ফুসফুসের ভিতর কিছুটা বাতাস ঢুকাইয়া লওয়া ছাড়া উহা আর কি? রক্তশোধন ছাড়া উহার আর কোন প্রয়োজনই নাই; বাহির হইতে আমরা যে বায়ুকে নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লই এবং উহাকে রক্তশোধনের কার্যে নিয়োগ করি, সে বায়ুর মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; ঐ ক্রিয়াটা তো একটা স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই গতিটিকে প্রাণ-নামক একটি মাত্র স্পন্দনে পরিণত করা যায়; আর সব জায়গায় সব গতিই এই প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যুৎ, এই প্রাণই চৌম্বক-শক্তি; মস্তিষ্ক এই প্রাণকেই চিন্তারূপে বিকীর্ণ করে। সবই প্রাণ; প্রাণই চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রগণকে চালিত করিতেছে।

আমরা বলি—বিশ্বের যাহা কিছু আছে, তাহা সবই এই প্রাণের স্পন্দনের ফলে বিকাশলাভ করিয়াছে। স্পন্দনের সর্বোচ্চ ফল চিন্তা। ইহা অপেক্ষাও বড় যদি কিছু থাকে, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইড়া ও পিঙ্গলা নামক নাড়ীদ্বয় প্রাণের সাহায্যে কাজ করে। প্রাণই বিভিন্ন শক্তিরূপে পরিণত হইয়া শরীরের প্রতি অঙ্গকে পরিচালিত করে। ভগবান্ জগৎরূপে কার্যের স্রষ্টা এবং সিংহাসনের উপরে বসিয়া ন্যায়বিচার করিতেছেন—ভগবান্ সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ কর। কাজ করিতে করিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কারণ ঐ কার্যে আমাদের কিছুটা প্রাণ-শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রাণের ক্রিয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, তখন দেহের সব-কিছুই ঠিকমত কাজ করে। যোগীদের যখন নিজ শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তখন শরীরের কোন অংশ অসুস্থ হইলে

তাঁহারা টের পান যে, প্রাণ সেখানে ঠিকমত ছন্দে চলিতেছে না, এবং যতক্ষণ না সহজ ছন্দ ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রাণকে সেদিকে সঞ্চালিত করেন।

তোমার নিজের প্রাণকে যেমন তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তেমনি যথেষ্ট শক্তিমান্ হইলে এখানে বসিয়াই ভারতে অবস্থিত অপর একজনের প্রাণকেও তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। সব প্রাণই এক, মাঝখানে কোন ছেদ নাই; একত্বই সর্বত্র বিদ্যমান। দৈহিক দিক্ দিয়া, আত্মিক মানসিক ও নৈতিক দিক্ দিয়া, আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া সবই এক। জীবন একটি স্পন্দন মাত্র। যাহা এই (বিশ্বব্যাপী জড়) 'আকাশ'-সমুদ্রকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই তোমার ভিতরও স্পন্দন জাগাইতেছে। কোন হ্রদে যেমন কাঠিন্যের মাত্রার তারতম্য বিশিষ্ট অনেকগুলি বরফের স্তর গড়িয়া ওঠে, অথবা কোন বাষ্পের সাগরে বাষ্পস্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে, এই বিশ্বটিও যেন সেই ধরনের জড় পদার্থের একটি সমুদ্র। ইহা একটি 'আকাশের' সমুদ্র; ইহার ভিতর ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে আমরা চন্দ্র, সূর্য, তারা ও আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রহিয়াছে, সব স্থান জুড়িয়া সেই একই পদার্থ বিদ্যমান।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগৎ বস্তুতঃ এক; অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং প্রাণ-জগৎ—এরূপ কোন ভেদ নাই। সবই এক জিনিষ, যদিও অনুভূতির বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা হইতেছে। যখন তুমি নিজেকে দেহ বলিয়া ভাব, তখন তুমি যে মন, সে-কথা ভুলিয়া যাও; আবার নিজেকে যখন মন বলিয়া ভাব, তখন শরীরের কথা ভুলিয়া যাও। 'তুমি'-নামধেয় একটি মাত্র সত্তাই আছে; সে বস্তুটিকে তুমি জড়পদার্থ বা শরীর বলিয়া মনে করিতে পার, অথবা সেটিকে মন বা আত্মারূপেও দেখিতে পার। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এ-সব প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। কেহ কখনও জন্মায় নাই, কেহ কখনও মরিবেও না; আমরা শুধু স্থান পরিবর্তন করি—আর বেশী কিছু নয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা যে মরণকে এত বড় করিয়া ভাবে, তাহাতে আমি দুঃখিত; সব সময় তাহারা একটু আয়ুলাভের জন্য লালায়িত। 'মৃত্যুর পরেও যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি; আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও!' যদি কেহ তাহাদের শোনায় যে, মৃত্যুর পরেও তাহারা বাঁচিয়া

থাকিবে, তাহা হইলে তাহারা কী খুশীই না হয়! এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আসে কি করিয়া! কি করিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, আমরা মরিয়া গিয়াছি! নিজেকে মৃত বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে তোমার নিজের মৃতদেহ দেখিবার জন্য তুমি বাঁচিয়াই আছ। বাঁচিয়া থাকা এমন একটি অদ্ভুত সত্য যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তাহা ভুলিতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ হইতে পারে না, বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। চেতনার প্রথম প্রমাণই হইল—'আমি আছি'। যে অবস্থা কোন কালে ছিল না, তাহার কল্পনা করা চলে কি? সব সত্যের মধ্যে ইহা সব চেয়ে বেশী স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। যাহা কল্পনা করা যায় না, তাহা লইয়া কোন আলোচনা চলে কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সত্যাসত্য লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাহিব কেন?

কাজেই যে দিক্ হইতেই দেখা যাক না কেন, গোটা বিশ্বটি একটি অখণ্ড সত্তা। এই মুহূর্তে বিশ্বটিকে প্রাণ ও আকাশের, শক্তি ও জড়পদার্থের একটি অখণ্ড সত্তা বলিয়া আমরা ভাবিতেছি। মনে থাকে যেন, অন্যান্য মূল তত্ত্বগুলির মত এ তত্ত্বটিও স্ব-বিরোধী। কারণ শক্তি মানে কি?—যাহা জড়পদার্থে গতির সঞ্চার করে, তাহাই শক্তি। আর জড়পদার্থ কি?—যাহা শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। এরূপ সংজ্ঞা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষে দুষ্ট। জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের এত গর্ব সত্ত্বেও আমাদের যুক্তির কতকগুলি মূল উপাদান বড়ই অদ্ভুত ধরনের। আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে—'মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা!' এই জাতীয় পরিস্থিতিকে 'মায়া' বলে। ইহার অস্তিত্ব নাই, নাস্তিত্বও নাই। ইহাকে 'সৎ' বলিতে পার না, কারণ যাহা দেশ-কালের অতীত, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই শুধু 'সৎ'। তবু অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সহিত এই জগতের অনেকটা মিল আছে বলিয়া ইহার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়।

কিন্তু যেটি আসল সদ্‌বস্তু, পারমার্থিক সত্তা, তাহা সব-কিছুরই ভিতর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে; সেই সত্তাই যেন ধরা পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। এই অসীম, অনাদি, অনন্ত, চির-আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্‌বস্তুটিই আমাদের স্বরূপ, আসল মানুষ। এই

আসল মানুষটি জড়াইয়া পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। জগতের সব-কিছুরই এই একই অবস্থা। সব-কিছুরই সত্যস্বরূপ হইতেছে এই সীমাহীন অস্তিত্ব। (বস্তুশূন্য) বিজ্ঞানবাদের কথা নয় এ-সব; এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ইহার একটি আপেক্ষিক সত্তা আছে। কিন্তু ইহার অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পারমার্থিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ দাঁড়াইয়া আছে।

বিষয়বস্তু ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখন মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসা যাক। আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে (দেহের মধ্যে) যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা সবই স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে যে-সব কাজ চলে, সেগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিলে কত ভাল হয়, বল দেখি!

ঈশ্বর কাহাকে বলে, মানুষ কাহাকে বলে, পূর্বে তাহা তোমাদের বলিয়াছি। মানুষ যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র সর্বত্র বিদ্যমান। ঈশ্বর সকলের হাত দিয়াই কাজ করেন, সব চোখ দিয়াই দেখেন, সব পা দিয়াই হাঁটেন, সকল শরীর অবলম্বনে শ্বাস-গ্রহণ করেন, সকল জীবন অবলম্বনেই জীবনধারণ করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়া কথা বলেন এবং প্রত্যেক মস্তিষ্কের ভিতর দিয়াই চিন্তা করেন। মানুষ যদি তাহার আত্মচেতনার কেন্দ্র অনন্তগুণে বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের মত হইতে পারে, সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করিতে পারে। কাজেই আমাদের অনুধ্যানের প্রধান বিষয় হইল চেতনা। ধর, যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি আদি-অন্তহীন রেখা রহিয়াছে। রেখাটিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাহার উপর দিয়া একটি জ্যোতির্বিন্দু সঞ্চরণ করিতেছে। রেখাটির উপর দিয়া চলিবার সময় জ্যোতির্বিন্দুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর আলোকিত করিতেছে, আর যে অংশ পিছনে পড়িতেছে, তাহা আবার অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। আমাদের চেতনাকে এই জ্যোতির্বিন্দুটির সহিত তুলনা করা যায়। বর্তমানের অনুভূতি

আসিয়া অতীতের অনুভূতিগুলিকে সরাইয়া দিতেছে, অথবা অতীত অনুভূতিগুলি অবচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা টের-ই পাই না যে, সেগুলি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; সেগুলি আছে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের দেহমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। চেতনার সাহায্য ছাড়া আমাদের অভ্যন্তরে যে-সব কার্য এখন চলিতেছে, সেগুলি সবই একদিন আমাদের সজ্ঞানে সাধিত হইত। এখন স্বয়ংক্রিয় হইয়া চলার মত যথেষ্ট প্রেরণাশক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সব নীতিশাস্ত্রেই এই একটা বড় রকমের ভুল ধরা পড়ে যে, কি উপায়ে মানুষ খারাপ কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে, সেই শিক্ষা ঐ নীতিশাস্ত্রগুলিতে নাই। সব নীতিপদ্ধতিই শিখায়, 'চুরি করিও না।' খুব ভাল কথা। কিন্তু মানুষ চুরি করে কেন? ইহার কারণ এই যে, সর্বক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি খারাপ কাজগুলি সবই আপনা-আপনি ঘটিয়া যায়। দাগী চোর-ডাকাতেরা, মিথ্যাবাদীরা, অন্যায়কারী নর-নারী—সকলেই নিজ নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্যই মনস্তত্ত্বের একটি বড় সমস্যা। মানুষের বিচার—আমাদিগকে অতি উদার সহৃদয় দৃষ্টি লইয়াই করিতে হইবে।

ভাল হওয়া অত সোজা নয়। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত তুমি তো একটি যন্ত্রমাত্র, তার বেশী আর কি? নিজে ভাল বলিয়া তোমার গর্ব করা কি উচিত? নিশ্চয়ই না। তুমি ভাল, কারণ এরূপ না হইয়া তোমার উপায় নাই। আর একজন খারাপ, কারণ সেও ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার অবস্থায় পড়িলে তুমি যে কি হইতে, কে জানে? দুশ্চরিত্রা নারী বা জেলখানার চোর তো তোমাদেরই হিতার্থে যীশুখ্রীষ্টের মত বলিপ্রদত্ত হইতেছে, যাহাতে তোমরা ভাল হও। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ধারাই এই। যত চোর ও খুনী আছে, যত বিচারবুদ্ধিহীন, যত দুর্বলতম ব্যক্তি, যত পাপিষ্ঠ, যত দানবপ্রকৃতির লোক আছে, আমার দৃষ্টিতে তাহারা সকলেই এক একজন যীশু। দেবরূপী খ্রীষ্ট এবং দানবরূপী খ্রীষ্ট উভয়েই আমার পূজার্হ, এই আমার মত; ইহা ছাড়া অন্য ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। সতের চরণে, সাধুর পাদপদ্মে, দুষ্টের চরণে, দানবের পদেও আমার নমস্কার। তাহারা সবাই আমার শিক্ষক, আমার ধর্মগুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা। কাহাকেও হয়তো আমি

অভিশাপ দিই, কিন্তু তবু তাহার পতনের ফলে উপকৃত হই; আবার—অপরকে হয়তো আশীর্বাদ করি, আর তাহারও সৎকর্মের ফলে উপকৃত হই। আমার এখানে উপস্থিতি যতটা সত্য, আমি যাহা বলিলাম, তাহাও ততখানি সত্য। পতিতা নারীকে দেখিয়া আমাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, কারণ সমাজ তাহাই চায়, যদিও সে আমার ত্রাণকর্ত্রী, যদিও তাহার পতিতাবৃত্তির ফলে অপর স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পাইতেছে। কথাটি ভাবিয়া দেখ। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মনে মনে কথাটি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। কথাটি সত্য—নিরাবরণ, নির্ভীক সত্য। আমি যত বেশী করিয়া জগৎকে দেখিতেছি, যত বেশী সংখ্যক নর-নারীর সম্পর্কে আসিতেছি, আমার এই বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইতেছে। কার দোষ দিব? কার প্রশংসা করিব? সব-কিছুরই দুটি দিকই দেখিতে হইবে।

সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা বিপুল; আমাদের অবচেতন স্তরে যে-সব অসংখ্য চিন্তা ডুবিয়া রহিয়াছে, আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াই যেগুলি নিজে নিজে কাজ করিয়া চলে, সেগুলিকে স্ববশে আনিতে চাওয়াই হইল আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। খারাপ কাজটি অবশ্য চেতনস্তরেই ঘটে, কিন্তু যে কারণ কাজটিকে ঘটাইল, তাহা ছিল আমাদের অগোচরে বহুদূরে—অবচেতনার রাজ্যে; সেজন্য তাহার শক্তিও বেশী।

ফলিত মনস্তত্ত্ব প্রথমেই অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে; আর ইহা জানা কথা যে, আমরা উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারি। কেন পারি? কারণ আমরা জানি যে, চেতনই অবচেতনের কারণ; আমাদের অতীতের যে লক্ষ লক্ষ চেতন-চিন্তাগুলি মনের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই অবচেতন চিন্তা; অতীতের সজ্ঞান ক্রিয়াগুলিই নিষ্ক্রিয় ও অবচেতনরূপে থাকে; আমরা আর সেগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাই না, সেগুলিকে চিনি না; সেগুলির কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, অবচেতন স্তরে যেমন পাপের শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তেমনি পুণ্যের শক্তিও আছে। আমাদের অন্তরে অনেক কিছু সঞ্চিত আছে, যেন একটি থলির মধ্যে সব পুরিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা সেগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সেগুলির কথা ভাবি না পর্যন্ত; আর তাহার ভিতর এমন অনেক চিন্তা আছে, যেগুলি পচিয়া যাইতেছে, পচিয়া নিশ্চিত বিপদের

কারণ হইতেছে; এই-সব অবচেতন কারণই বাহিরে আসিয়া মানব-সমাজকে ধ্বংস করে। সেজন্য যথার্থ মনস্তত্ত্বের উচিত—যাহাতে এগুলিকে চেতনার আয়ত্তে লইয়া আসা যায়, তাহার চেষ্টা করা। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে গোটা মানুষটিকেই যেন জাগাইয়া তুলিবার বিশাল কর্তব্য, যাহাতে সে নিজের সর্বময় কর্তা হইতে পারে। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্রের কাজকে আমরা স্বয়ংক্রিয় বলিয়া থাকি, যেমন যকৃতের ক্রিয়া, সেগুলিকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছাধীন করা যায়।

এ-বিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হইল অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরের অংশ—চেতনারও পারে চলিয়া যাওয়া। অবচেতনের কাজ যেমন চেতনার নিম্নস্তরে হয়, তেমনি আর এক ধরনের কাজ হয় চেতনার ঊর্ধ্বে, অতিচেতন স্তরে। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ করে; মৃত্যু অমরত্বে রূপায়িত হয়, দুর্বলতা অনন্তশক্তির রূপ নেয়, এবং লৌহশৃঙ্খল পর্যবসিত হয় মুক্তিতে। অতিচেতনার এই সীমাহীন রাজ্যই আমাদের লক্ষ্য।

কাজেই এখন পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কাজটিকে দু-ভাগে ভাগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা নামে শরীরে যে দুটি সাধারণ (স্নায়বিক) প্রবাহ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত চালাইয়া অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ চেতনারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে হইবে।

শাস্ত্রে বলে, আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে যিনি এই সত্যে পৌঁছিয়াছেন, তিনিই যোগী। এই অবস্থায় সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যায়। সুষুম্নার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে; ইতঃপূর্বে এই নূতন পথে কোন প্রবাহ প্রবেশ করে নাই। প্রবাহটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, এবং বিভিন্ন পদ্মগুলি (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না-কেন্দ্রগুলি, যোগশাস্ত্রের ভাষায় এগুলিকে 'পদ্ম' বলা হয়) অতিক্রম করিয়া অবশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়। যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করেন।

নির্বিশেষভাবে আমরা সকলেই যোগের এই চরম অবস্থা লাভ করিতে পারি। কাজটি কিন্তু দুরূহ। যদি কেহ এই সত্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই বা কিছুটা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই চলিবে না। প্রস্তুতির উপরেই সব-কিছু নির্ভর করে। একটি আলো জ্বালিতে কতটুকু আর সময় লাগে? মাত্র এক সেকেণ্ড; কিন্তু বাতিটি প্রস্তুত করিতে কতখানি সময় যায়! দিনের প্রধান ভোজনটি করিতে আর কতটুকু সময় লাগে? বোধ হয় আধঘণ্টার বেশী দরকার হয় না। কিন্তু খাবারগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আলো জ্বালিতে চাই আমরা, কিন্ত ভুলিয়া যাই যে, বাতিটি প্রস্তুত করাই হইল প্রধান কাজ।

লক্ষ্যলাভ এত কঠিন হইলেও তাহার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও কিন্তু বৃথা যায় না। আমরা জানি, কিছুই লুপ্ত হইয়া যায় না। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘এজন্মে যাহারা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা কি ছিন্ন মেঘের মত বিনষ্ট হইয়া যায়?’ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, ‘সখা, এ-জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না। মানুষ যাহা কিছু করে, তাহা তাহারই থাকিয়া যায়। এজন্মে যোগের ফললাভ করিতে না পারিলেও পরজন্মে আবার সে সেই ভাবেই চলিতে শুরু করে।’ এ-কথা না মানিলে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্যাবস্থার ব্যাখ্যা করিবে কিরূপে?

প্রাণায়াম, আসন—এগুলি যোগের সহায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-সবই দৈহিক। বড় প্রস্তুতি হইতেছে মনের ক্ষেত্রে। তাহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন—শান্ত সমাহিত জীবন।

যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বাধীন হইতেই হইবে, এবং এমন এক পরিবেশে নিজেকে রাখিতে হইবে, যেখানে তুমি একাকী ও সর্ববিধ উদ্বেগমুক্ত। যে আরামপ্রদ সুখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে চায়, তাহার অবস্থা সেই মূর্খেরই মত, যে কাষ্ঠখণ্ড-ভ্রমে একটি কুমীরকে আঁকাড়াইয়া নদী পার হইতে চায়। ‘আগে ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ কর, তাহা হইলে সব-কিছুই তোমার নিকট আসিয়া পড়িবে।’ ইহাই সর্বোত্তম কর্তব্য, ইহাই বৈরাগ্য। একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আর কোন কিছু যেন মনে স্থান না পায়। যাহার কোন কালে বিনাশ নাই তাহাকে অর্থাৎ আমাদের

আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে পাইবার জন্য যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করি। অনুভূতিলাভের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমাদিগকে লড়িতেই হইবে; সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই আমরা উন্নত হইব। অনেক কিছু ভুলভ্রান্তি হইবে; কিন্তু তাহারাই হয়তো ভুলের ছদ্মবেশে আমাদের কল্যাণসাধনের দেবদূত।

ধ্যানই অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। ধ্যানকালে আমরা সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হই, এবং নিজ ভাগবত স্বরূপ উপলব্ধি করি। ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ্য সহায়তার উপর নির্ভর করি না। আত্মার স্পর্শে মলিনতম স্থানগুলিও উজ্জ্বলতম বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইতে পারে, জঘন্যতম বস্তুও সুরভিমণ্ডিত হইতে পারে, পিশাচও দেবতায় পরিণত হইতে পারে, তখন সব শত্রুভাব–সব স্বার্থ শূন্যে লীন হয়। দেহবোধ যত কম আসে ততই ভাল। কারণ দেহই আমাদের নীচে টানিয়া আনে। দেহের প্রতি আসক্তির জন্য, দেহাত্মবোধের জন্য আমাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া ওঠে। রহস্যটি এইঃ চিন্তা করিতে হয়–আমি দেহ নই, আমি আত্মা, ভাবিতে হয়–সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাহা কিছু সবই, তাহার ভালমন্দ সব-কিছুই হইতেছে পরপর সাজান কতকগুলি ছবির মত, পটে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর মত, আমি তাহার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা।

১০. রাজযোগ-প্রসঙ্গে

যোগের প্রথম সোপান যম।
যম আয়ত্ত করিতে পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজনঃ

১. কায়মনোবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করা।
২. কায়মনোবাক্যে সত্য কথা বলা।
৩. কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।
৪. কায়মনোবাক্যে পরম পবিত্রতা রক্ষা করা।
৫. কায়মনোবাক্যে অপাপবিদ্ধতা।

পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইহার সম্মুখে সব-কিছু নিস্তেজ। তারপর 'আসন' বা সাধকের বসিবার ভঙ্গী। আসন দৃঢ় হওয়া চাই, এবং শির পঞ্জর এবং দেহ ঋজু ও সরলরেখায় অবস্থিত হইবে। মনে মনে চিন্তা কর—তোমার আসন দৃঢ়, কোন কিছু তোমাকে টলাইতে পারিবে না। অতঃপর চিন্তা কর—মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটু একটু করিয়া তোমার সমগ্র দেহ বিশুদ্ধ হইতেছে। চিন্তা কর—শরীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য ইহা একটি নিখুঁত শক্ত ভেলা।

ঈশ্বরের নিকট, জগতের সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকর্তা এবং পবিত্রাত্মাদের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহারা যেন তোমায় সাহায্য করেন। তারপর আধ ঘণ্টা প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক অভ্যাস কর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত মনে মনে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ কর। এই আধ্যাত্মিক শব্দের অদ্ভুত শক্তি আছে।

যোগের অন্যান্য স্তরঃ (১) প্রত্যাহার অর্থাৎ সকল বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া সম্পূর্ণরূপে মানসিক ধারণার দিকে পরিচালিত করা; (২) ধারণা অর্থাৎ অবিচল একাগ্রতা; (৩) ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তা; (৪) সমাধি অর্থাৎ (শুদ্ধ ধ্যান) রূপবিবর্জিত

ধ্যান। ইহা যোগের সর্বোচ্চ এবং শেষ স্তর। পরমাত্মায় সকল চিন্তাভাবনার নিরোধের নাম 'সমাধি'–যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়, 'আমি ও আমার পিতা এক।'

একবারে একটি কাজ কর, এবং উহা করিবার সময় অপর সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া উহাতেই সমগ্র মন অর্পণ কর।

১১. রাজযোগ-শিক্ষা

[ইংলণ্ডের শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত]

প্রাণ

পদার্থ (জড়প্রকৃতি) পাঁচ প্রকার অবস্থার অধীনঃ আকাশ, আলোক, বায়বীয়, তরল ও কঠিন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, বোম্—ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। অতি সূক্ষ্ম বায়ুর মত আদি পদার্থ হইতে ইহাদের উদ্ভব। বিশ্বের অন্তর্গত তেজ (বা শক্তি) 'প্রাণ' নামে অভিহিত—উহাই এই উপাদানগুলির (পঞ্চভূতের) মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান। প্রাণশক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত মনই মহা যন্ত্রস্বরূপ। মন জড়াত্মক। মনের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মাই প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাণ জগতের পরিচালক-শক্তি; জীবনের প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে প্রাণশক্তি দৃষ্ট হয়। দেহ নশ্বর, মনও নশ্বর; উভয়ই যৌগিক পদার্থ বলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। এই-সকলের পশ্চাতে আছে অবিনাশী আত্মা। শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা প্রাণের নিয়ামক ও পরিচালক। কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের চতুর্দিকে দেখি, তাহা সর্বদাই অপূর্ণ। এই বোধ পূর্ণতা লাভ করিলে যীশুখ্রীষ্টাদি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মন ও দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সকল বস্তুর পশ্চাতে—যথার্থ সত্তায় সকল প্রাণীই সমান।

মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা প্রাণশক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। শক্তির বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত পদার্থের প্রয়োজন। পরবর্তী প্রশ্ন হইল—প্রাণকে কিরূপে ব্যবহার করা যায়। আমরা সকলেই প্রাণের ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু কি শোচনীয় ভাবেই না উহার অপচয় ঘটে! প্রস্তুতির স্তরে প্রথম নীতি হইল সমুদয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-প্রসূত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য উহা উপলব্ধি করিতে হইবে। অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন—এই তিনটি স্তরে আমাদের মন ক্রিয়া

করিয়া থাকে। যোগীই কেবল অতিচেতন মনের অধিকারী। যোগের মূলতত্ত্ব হইল, মনের ঊর্ধ্বে গমন। আলোক অথবা শব্দের স্পন্দনমাত্রা অনুযায়ী এই তিনটি স্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আলোর কতগুলি স্পন্দন এত মন্থর যে, সহজে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না—স্পন্দনমাত্রা দ্রুত হইয়া আমাদের নিকট আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; তারপর স্পন্দনের বেগ এত দ্রুত হয় যে, আর উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, শব্দ সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না করিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারা যায়, তাহাই শিখিতে হইবে। কতকগুলি যৌগিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে গিয়া পাশ্চাত্য মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে ঐ শক্তিগুলি তাঁহাদের মধ্যে অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রায়ই ব্যাধির আকার ধারণ করে। হিন্দুগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়টি অনুশীলনপূর্বক নির্দোষ করিয়াছেন। এখন সকলেই কোন ভয় বা বিপদের আশঙ্কা না করিয়া উহা চর্চা করিতে পারে। অতিচেতন অবস্থার একটি সুন্দর প্রমাণ হইল মনের আরোগ্য-বিধান; কারণ—যে চিন্তা আরোগ্য সম্পাদন করে, তাহা প্রাণেরই একপ্রকার স্পন্দন এবং উহাকে ঠিক চিন্তা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষা উচ্চস্তরের এমন কিছু—যাহার নাম আমাদের জানা নাই।

প্রত্যেক চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ চিন্তার উদয় অথবা আরম্ভ—যাহার বিষয়ে আমরা সচেতন নই; দ্বিতীয়তঃ যখন চিন্তা মনের উপরিভাগে আসে; তৃতীয়তঃ যখন চিন্তা আমাদের নিকট হইতে সঞ্চারিত হয়। চিন্তা জলের উপরিভাগে অবস্থিত বুদ্বুদের ন্যায়। চিন্তা ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইলে উহাকে আমরা ‘শক্তি’ বলি। যে স্পন্দন দ্বারা তুমি পীড়িত ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে চাও, তাহা চিন্তা নয়—শক্তি। যে মানবাত্মা সকলের মধ্যে অনুস্যূত, সংস্কৃতে তাহাকে ‘সূত্রাত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

প্রাণের শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল ‘প্রেম’। যে মুহূর্তে প্রাণ হইতে প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত। এই প্রেম লাভ করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও মহৎ কাজ। অপরের দোষ দেখিও না, নিজেরই সমালোচনা করা উচিত। মাতালকে দেখিয়া নিন্দা করিও না; মনে রাখিও, মাতাল তোমারই আর একটি রূপ। যাহার নিজের মধ্যে মলিনতা

নাই, সে অপরের মধ্যেও মলিনতা দেখে না। তোমার নিজের মধ্যে যাহা আছে, তাহাই তুমি অপরের মধ্যে দেখিয়া থাক। সংস্কার-সাধনের ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা। যে-সকল সংস্কারক অন্যের দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি দোষাবহ কাজ বন্ধ করেন, তবে জগৎ আরও ভাল হইয়া উঠিবে। নিজের মধ্যে এই ভাব পুনঃপুনঃ ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

যোগ-সাধনা

শরীরের যথাযথ যত্ন লওয়া কর্তব্য। আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই দেহের পীড়ন করে। মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিও। বিষণ্ণভাব আসিলে পদাঘাতে তাহা দূর করিয়া দাও। যোগী অত্যধিক আহার করিবেন না, আবার উপবাসও করিবেন না; যোগী বেশী নিদ্রা যাইবেন না, আবার বিনিদ্রও হইবেন না। সর্ব বিষয়ে যিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন।

কোন্ সময় যোগাভ্যাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ? ঊষা ও সায়ংকালের সন্ধিক্ষণে যখন সমগ্র প্রকৃতি শান্ত থাকে, তখনই যোগের সময়। প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দভাবে আসনে বসিবে। মেরুদণ্ড ঋজু রাখিয়া, সম্মুখে বা পশ্চাতে না ঝুঁকিয়া শরীরের তিনটি অংশ—শির, গ্রীবা ও পঞ্জর সরল রাখিবে। অতঃপর দেহের এক একটি অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা কর—সমগ্র দেহটি সম্পূর্ণ বা নির্দোষ। তারপর সমগ্র বিশ্বে একটি প্রেমের প্রবাহ প্রেরণ কর এবং জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা কর। সর্বশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মনকে যুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে মনের গতিবিধির উপর একাগ্রতা-সাধনের ক্ষমতা অর্জন কর।

ওজঃশক্তি

যাহা দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের (একজনের সহিত অপরের) পার্থক্য নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। যাঁহার মধ্যে ওজঃশক্তির প্রাধান্য, তিনিই নেতা। ইহার প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আছে। স্নায়ুপ্রবাহ হইতে ওজঃশক্তির সৃষ্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ

যৌনশক্তিরূপে যাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃশক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় না হইলে উহাই ওজঃশক্তিতে পরিণত হইতে পারে। শরীরের দুইটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিরের পশ্চাদ্ভাগে স্নায়ুপ্রবাহ-দুইটি ৪ সংখ্যার মত আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত। এইরূপে শরীরের বাম অংশ মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুচক্রের সর্বনিম্নপ্রান্তে যৌনকেন্দ্র—মূলাধারে (Sacral Plexus) অবস্থিত। এই দুই স্নায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত শক্তির গতি নিম্নাভিমুখী এবং ইহার অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থিখণ্ড এই মূলাধারে অবস্থিত এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় উহাকে 'ত্রিকোণ' বলা হয়। সমস্ত শক্তি উহার পার্শ্বে সঞ্চিত হয় বলিয়া ঐ শক্তি সর্পরূপ প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হয়। চেতন ও অবচেতন—এই দুইটি স্নায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। কিন্তু অতিচেতন যখন এই চক্রের নিম্নভাগে উপনীত হয়, তখন স্নায়ুপ্রবাহের ক্রিয়া বন্ধ হয়, এবং ঊর্ধ্বগামী হইয়া চক্রাকার সম্পূর্ণ করিবার পরিবর্তে স্নায়ুকেন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইয়া ওজঃশক্তিরূপে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের ঐ ক্রিয়া (সুষুম্না নাড়ী) বন্ধ থাকে, কিন্তু ওজঃশক্তির গমনাগমনের নিমিত্ত উহা উন্মুক্ত হইতে পারে। এই ওজঃপ্রবাহ মেরুদণ্ডের একটি চক্র হইতে অপর চক্রে ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি (যোগী) জীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উপনীত হইতে পার। মনুষ্যদেহধারী আত্মার পক্ষে সর্বপ্রকার স্তরে উপনীত হওয়া ও সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব বলিয়াই সে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষের পক্ষে অন্য ধরনের দেহ আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইচ্ছা করিলে এই দেহেই তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে। ওজঃশক্তি যখন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ধাবিত হইয়া অবশেষে সহস্রারে Pineal Gland-এ (মস্তিষ্কের যে অংশের কোন ক্রিয়া আছে কিনা শরীরবিজ্ঞান বলিতে পারে না) আসিয়া উপনীত হয়, তখন মানুষ দেহও নয়, মনও নয়; তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত।

যৌগিক শক্তির মহা বিপদ এই যে, ঐ শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া মানুষ পড়িয়া যায়, এবং উহার যথার্থ প্রয়োগ জানে না। যে-ক্ষমতা সে লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার কোন শিক্ষা এবং জ্ঞান নাই। বিপদ এই যে, এই-সকল যৌগিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যৌনানুভূতি অস্বাভাবিকরূপে জাগ্রত হয়, কারণ বাস্তবিকপক্ষে যৌনকেন্দ্র হইতেই এই-সকল শক্তির উদ্ভব। যৌগিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ না করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উত্তম পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অধিকারীর উপর ঐ শক্তিগুলি অতি মারাত্মক রকমের ক্রিয়া করে।

প্রতীকের প্রসঙ্গে বলিতেছি। মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বে এই ওজঃশক্তির গতি পেঁচান স্ক্রু-র মত অনুভূত হয় বলিয়া উহাকে 'সর্প' বলা হয়। ঐ সর্পের অবস্থান ত্রিকোণের উপরে। যখন ঐ শক্তি জাগ্রত হয়, তখন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া যায় এবং এক চক্র হইতে অন্য চক্রে বিচরণকালে আমাদের অন্তরে এক নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত হয়—অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম-অভ্যাস হইতেছে অতিচেতন মনের শিক্ষা। শরীরের দ্বারা যে অভ্যাস করিতে হয় (শারীরিক প্রক্রিয়া), তাহা তিন অংশে বিভক্ত এবং উহার কার্য প্রাণবায়ু লইয়া—অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ (পূরক, কুম্ভক ও রেচক)। চার সংখ্যা গণনা করিতে করিতে এক নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ুগ্রহণ করিতে হইবে, ষোল সংখ্যা গণনা করিতে করিতে উহা ধারণ করিবে এবং আট সংখ্যা গণনা করিতে করিতে অপর নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ু (নিঃশ্বাস) ত্যাগ করিতে হইবে। অতঃপর নিঃশ্বাস লইবার সময় অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বিপরীতভাবে উহার অভ্যাস করিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক নাসারন্ধ্র বন্ধ রাখিয়া এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু যথাসময়ে প্রাণবায়ু তোমার বশে (আয়ত্তে) আসিবে। সকাল-সন্ধ্যায় চারিবার এইরূপ প্রাণায়াম করিবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে

'অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য তোমার সন্নিকটে।' 'অনুতাপ' শব্দটি গ্রীকভাষায় ' Metanoctic' (Meta শব্দের অর্থ—ঊর্ধ্বে, অতীত) এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞানের পারে যাও'—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে—'এবং স্বীয় অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, যেখানে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইবে।'

স্যর হ্যামিলটন কোন দার্শনিক আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, 'এখানে দর্শনের অবসান (সমাপ্তি), এখানে ধর্মের আরম্ভ।' বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নাই এবং কখনও থাকিতে পারে না। বুদ্ধিপ্রসূত বিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে জানিতে সমর্থ নন, এবং তাঁহারা ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন, কারণ ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জ্ঞান তাঁহারা নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অতএব ধর্মকে প্রমাণ করিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ও তত্ত্বদর্শিগণ 'ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন' বলিয়া দাবী করেন, অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, এবং স্বীয় অন্তরেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। মানুষ যখন এই বিশ্বের অন্তর্গত সেই পরম সত্য দর্শন করে, কেবল তখনই তাহার সকল সন্দেহের নিরসন হয়, এবং হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহাই 'ঈশ্বর-দর্শন'। আমাদের কাজ হইল—সত্যকে নিরূপণ করা, কেবল মতামত গলাধঃকরণ করিলে চলিবে না। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধর্মজগতেও সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহার বাহিরে যাইলেই উহা সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মজগতের সত্যসমূহ যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর-দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য, শক্তিলাভ নয়। শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও প্রেমই জীবনের লক্ষ্য; এবং প্রেমই ঈশ্বর-স্বরূপ।

চিন্তা , কল্পনা ও ধ্যান

স্বপ্নে ও চিন্তায় আমরা যে বৃত্তি অর্থাৎ কল্পনা প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাই সত্যে উপনীত হইবার উপায় হইবে। কল্পনাশক্তি অধিক প্রবল হইলে বিষয়বস্তু দৃষ্ট হয়। অতএব কল্পনা-সহায়ে আমরা শরীরকে সুস্থ অথবা পীড়িত অবস্থায় আনিতে পারি। যখন কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির অবস্থান নলের ভিতর দিয়া নানা রঙের কাঁচখণ্ডের প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্ট কারুকার্যের ন্যায় হইয়া থাকে (Kaleidoscopic)। মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির ঐরূপ সংস্থাপন ও সংযোগের পুনঃপ্রাপ্তিই 'স্মৃতি' বলিয়া অভিহিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হয়, মস্তিষ্কের পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাসের সফলতা তত অধিক হইয়া থাকে। দেহকে আরোগ্য করিবার একটিমাত্র শক্তিই আছে, এবং ঐ শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। ঔষধ ঐ শক্তিকে উদ্দীপিত করে মাত্র। দেহের মধ্যে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, ঐ শক্তি দ্বারা তাহা বিতাড়িত হয়, এবং দেহের রোগ ঐ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। যদিও ঔষধের দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট বিষ দূরীভূত করিবার শক্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, চিন্তাশক্তির দ্বারাই উহা অধিকতর স্থায়িভাবে উদ্দীপিত হয়। পীড়ার সময় যাহাতে আদর্শ স্বাস্থ্যের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং সুস্থ থাকাকালীন মস্তিষ্কের পরমাণুগুলি যে-অবস্থায় ছিল, পুনর্বিন্যাসের সময় আবার সেরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি- সম্বন্ধীয় চিন্তায় কল্পনার আধিপত্য প্রয়োজন। ঐ অবস্থায় শরীর মস্তিষ্কের অনুসরণ করিবার প্রবণতা লাভ করে। পরবর্তী ক্রম হইল আমাদের উপর অপরের মনের ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত প্রণালীতে উপনীত হইতে পারা। ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখা যায়। যে উপায়ে এক মনের উপর অপর মন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা শব্দ। সৎ ও অসৎ চিন্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রভাবসম্পন্ন শক্তি এবং এই বিশ্ব ঐরূপ চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। অনুভূত না হইলেও কম্পন যেমন চলিতে থাকে, সেইরূপ কার্যে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা চিন্তারূপেই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঘুঁষি না মারা পর্যন্ত হাতের মধ্যে উহার শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অবশেষে উহা কার্যে রূপান্তরিত হইয়া ঘুঁষিতে পরিণত হয়। আমরা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ চিন্তার উত্তরাধিকারী। যদি আমরা নিজেদের পবিত্র ও সৎচিন্তার যন্ত্রস্বরূপ করি, তবে সৎ চিন্তা-সকল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শুদ্ধাত্মা কখনও অসৎ চিন্তা গ্রহণ করিবে না। অসৎ

লোকের মনই অসৎ চিন্তাগুলির উপযুক্ত ক্ষেত্র। এগুলি ঠিক জীবাণুর মত উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। চিন্তাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায়; নূতন নূতন আবেগ ঐগুলিতে কম্পন সৃষ্টি করিয়া চিন্তারাজ্যে উদিত হয়; অবশেষে এক বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অপরগুলিকে আত্মসাৎ করে। প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর এই বিশ্বজনীন চিন্তাপ্রবাহের পুনরুত্থান ঘটে, এবং তখন ঐ বৃহৎ তরঙ্গটি অন্যান্য ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। এইরূপে একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে-যুগে বাস করেন, সে-যুগের চিন্তাসমূহ তিনি নিজ মনের মধ্যে ধারণ করেন এবং ঐগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়া মানবজাতির নিকট অর্পণ করেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বৃহদাকার তরঙ্গের দৃষ্টান্তস্বরূপ; তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারস্পরিক ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসরের। যে-তরঙ্গের পশ্চাতে সর্বদা অত্যুজ্জ্বল পবিত্রতা ও মহত্তম চরিত্র বিরাজ করে, তাহাই পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর একবার আমাদের যুগে চিন্তাতরঙ্গের স্পন্দন বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব উহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং নানা আকারে ও নানা সম্প্রদায়ে উহা আবির্ভূত হইতেছে। এই-সব তরঙ্গের উদ্ভব ও বিলয় পর্যায়ক্রমে হইলেও গঠনমূলক ভাব সর্বদা ধ্বংসের অবসান ঘটায়। তখন মানুষ নিজ আধ্যাত্মিক স্বরূপ লাভের নিমিত্ত গভীরে ডুব দেয়, সে নিজেকে কখনও কুসংস্কার দ্বারা বদ্ধ বলিয়া অনুভব করে না। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং উহারা বুদ্বুদের ন্যায় ওঠে ও পড়ে, কারণ ঐ-সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাধারণতঃ চরিত্রবল নাই। পূর্ণ প্রেম ও প্রতিক্রিয়াহীন হৃদয় দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। নেতা চরিত্রহীন হইলে তাহার প্রতি আনুগত্য সম্ভব নয়। পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারাই স্থায়ী আনুগত্য ও বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে লাভ করা যায়।

একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধৈর্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাও; তোমার জীবনে সূর্যোদয় হইবেই।

কল্পনার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসা যাক।

কুণ্ডলিনীকে এমনভাবে কল্পনা করিতে হইবে যেন তাহা বাস্তব। ত্রিকোণ-অস্থিখণ্ডে কুণ্ডলী-আকারে সর্পটি অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীক।

তারপর পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস কর এবং নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া বা শ্বাসবন্ধ করিয়া উহাতে ৪ সংখ্যা আকৃতির নিম্নে প্রবহমান স্রোতের মত কল্পনা কর। স্রোত যখন নিম্নতম অংশে উপনীত হয়, তখন উহা ত্রিকোণাবস্থিত সর্পটিকে আঘাত করে এবং ফলে সর্পটি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়—এইরূপ চিন্তা কর। চিন্তা দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে ত্রিকোণাভিমুখে পরিচালনা কর।

দৈহিক প্রণালী আমরা এখন শেষ করিলাম এবং এই অংশ হইতে মানসিক প্রণালীর আরম্ভ।

প্রথম প্রক্রিয়ার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। দৈহিক প্রণালী শেষ হইলে মনকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দাও, বাধা দিও না। কিন্তু সাক্ষীর ন্যায় উহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখ। এইরূপে এই মন তখন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—অভিনেতা ও দ্রষ্টা। তারপর মনের যে-অংশ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, তাহাকে শক্তিশালী কর এবং মনের গতিবিধি দমন করিবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। মন অবশ্যই চিন্তা করিবে; কিন্তু ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ সাক্ষী যখন তাহার কার্য করিয়া যাইবে, অভিনেতা—মন অধিকতর আয়ত্ত হইবে, যে-পর্যন্ত না তোমার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াঃ ধ্যান। ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা স্থূলদেহধারী এবং আমাদের মনও রূপ চিন্তা করিতে বাধ্য। ধর্ম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং বাহ্যরূপও অনুধ্যানের সাহায্য করে। কোন রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান) করিতে পার না। চিন্তা করিতে গেলে কোন না কোন 'রূপ' আসিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য। সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্টা কর।

তৃতীয় প্রক্রিয়াঃ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় এবং ইহা যথার্থ 'একাগ্রতা' (একমুখীনতা)। মন সাধারণতঃ বৃত্তাকারে ক্রিয়া করে। কোন একটি বিন্দুতে মন নিবদ্ধ

করিতে চেষ্টা কর। অবশেষে ফললাভ। মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে আরোগ্যকরণ, 'জ্যোতিঃ' দর্শন ও সর্বপ্রকার যৌগিক শক্তি লাভ হয়। মুহূর্তমধ্যে তুমি এই চিন্তা-প্রবাহ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে পার, যেমন যীশুখ্রীষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করিবে।

পূর্বে যথাযথ শিক্ষা না থাকায় এই-সকল শক্তিদ্বারা অনেকের পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া যোগের এই স্তরগুলি খুব ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে বলি, তারপর সমস্তই তোমাদের আয়ত্তে আসিবে। প্রেম যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কিছু পরিমাণে আরোগ্যকরণ অভ্যাস করিতে পার, কারণ প্রেম কোন অনিষ্ট সাধন করে না।

মানুষমাত্রেই অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও ধৈর্যহীন। সকলেই শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই শক্তি অর্জন করিবার জন্য অতি অল্প লোকই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিতরণ করিতেই উৎসুক, কিছু সঞ্চয় করিবে না। অর্জন করিতেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু খরচ করিতে অল্প সময় লাগে। সুতরাং শক্তি অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অপচয় না করিয়া সঞ্চয় কর।

রিপুর প্রত্যেকটি তরঙ্গ দমন করিলে তাহা তোমার অনুকূলে সমতা রক্ষা করে। অতএব ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রদর্শন না করাই উত্তম কৌশল। সকল নৈতিক বিষয়েই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না।' এই উপদেশ যে কেবল নীতিসঙ্গত, তাহা নয়; সত্যই ইহা উত্তম পন্থা। ইহা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত আমরা উহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করি না, কারণ যে-ব্যক্তি ক্রোধ প্রদর্শন করে, সে শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। মস্তিষ্কে ঐ-সকল ক্রোধ ও ঘৃণার সমাবেশ হইতে পারে, এরূপ সুযোগ মনকে দেওয়া সঙ্গত নয়। রসায়ন-বিজ্ঞানে মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকের কার্য সমাপ্ত হইবে। একত্ব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিজ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করে, এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই একত্ব লব্ধ হইয়াছে। মানুষ পূর্ণ ঐক্যে উপনীত হয় তখনই, যখন সে বোঝে, 'আমি ও আমার পিতা এক।'